182. Je. 917. 27.

জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ জ্ঞানপ্রচার-সমিতির পুস্তকাবলী।—তৃতীয় সংখ্যা।

স্বাভাবিক শব্দ

বা

মন্ত্র।

(মাননীয় বিচারপতি সার্ জন উড্রফ সাহেবের Natural Name
নামক বক্তৃতার সারাংশ অবলম্বনে)

অধ্যাপক
শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

জ্ঞানপ্রচার সমিতির সপ্তম ও অষ্টম অধিবেশনে বিবৃত।

ভাদ্র, ১৩২৬।

মূল্য ৷৷০ আনা।

182. Je. 919. 27.

জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ জ্ঞানপ্রচার-সমিতির পুস্তকাবলী।—তৃতীয় সংখ্যা।

স্বাভাবিক শব্দ

বা

মন্ত্র।

BENGAL ... ... 5 SEP 19 ...

(মাননীয় বিচারপতি সার্ জন উড্রফ সাহেবের Natural Name
নামক বক্তৃতার সারাংশ অবলম্বনে)

অধ্যাপক
শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

জ্ঞানপ্রচার সমিতির সপ্তম ও অষ্টম অধিবেশনে বিবৃত।

ভাদ্র, ১৩২৬।

মূল্য ॥০ আনা।

জ্ঞানপ্রচার-সমিতি হইতে
শ্রীরবীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী দ্বারা প্রকাশিত।
পঞ্চবটী কানন, ৪৬, মুরারীপুকুর রোড
মাণিকতলা, কলিকাতা।

IMPERIAL
3. 11 20

প্রিণ্টার—শ্রীবিহারীলাল নাথ,
এমারেল্ড প্রিণ্টিং ওয়ার্কস,
৯, নন্দকুমার চৌধুরীর ২য় লেন, কলিকাতা।

ভূমিকা

মাননীয় বিচারক সার জন্ উড্রফ 'মন্ত্রশাস্ত্রের ব্যাখ্যা ও বিবৃতি' নামে ধারাবাহিক কয়েকটি বক্তৃতা ইংরাজি ভাষায় দেন। যাঁহারা সে বক্তৃতাগুলি শুনিয়াছিলেন তাঁহারা জানেন যে সে বক্তৃতাগুলির ভিতরে অনেক নূতন তথ্য নিহিত ছিল—আমাদের অনেক শাস্ত্ররহস্যের ও সাধনপদ্ধতির বেশ একটা সরল ও যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যান দেওয়া হইয়াছিল। আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগে এরূপ পরীক্ষা, বিচার ও ব্যাখ্যানের আবশ্যকতা খুবই বেশী। সাহেবের ব্যাখ্যা শাস্ত্রসিদ্ধান্তের বড় বেশী দূর দিয়া যায় নাই, আমাদের বিশ্বাস; বরং পরীক্ষা ও বিচার দ্বারা সে সিদ্ধান্তকে অনেক স্থলে আরও দৃঢ়তর ও বলবত্তর করার প্রয়াস হইয়াছে। যাহা হউক, ইহা অভিজ্ঞব্যক্তিগণের বিবেচনার বিষয়। সাহেব Natural Name নামক যে বক্তৃতা পাঠ করেন, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় তাহার সারাংশ অবলম্বন করিয়া তত্ত্ববিদ্যা-সমিতিগৃহে 'স্বাভাবিক শব্দ বা মন্ত্র' নামে দুইটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। সাহেবের মূল বক্তৃতার উপর ইহা ভাষ্য। অনেক দৃষ্টান্ত, বিজ্ঞানের দিক্ দিয়া শব্দশক্তির পরীক্ষা এবং দুই একটি পৌরাণিক আখ্যায়িকার শব্দপক্ষে ব্যাখ্যার জন্য ভাষ্যকর্ত্তা নিজে দায়ী। ভবিষ্যতে সাহেবের অপরাপর বক্তৃতা-গুলিরও ব্যাখ্যা আমরা প্রকাশ করিবার আশা রাখি। 'স্বাভাবিক রূপ বা যন্ত্র' ইহার পরের পুস্তিকা হইবে। এ সম্বন্ধে সকল প্রবন্ধগুলি একসঙ্গে গ্রন্থাকারে বাহির করার সঙ্কল্প আমাদের আছে। সাধারণের আগ্রহ ও সহানুভূতির উপর আমাদের সকল অনুষ্ঠানের সাফল্য নির্ভর করিতেছে। ইতি—

পঞ্চবটী কানন,
মাণিকতলা, কলিকাতা।
১৬ই ভাদ্র, ১৩২৬।

প্রকাশক

স্বাভাবিক শব্দ বা মন্ত্র

(Natural Name).

বেদে আমরা দেখিতে পাই যে, সৃষ্টি শব্দপূর্ব্বিকা—জগৎ শব্দপ্রভব। এ শব্দ কোন্ শব্দ ? আমরা কাণে যে শব্দ শুনিয়া থাকি সেই শব্দ কি ? আমরা কাণে যে শব্দ শুনি তাহা কতকগুলি উপাদান ও নিমিত্তের অপেক্ষা রাখে। প্রথমতঃ বায়ুমণ্ডলে কোনও এক স্থান হইতে একটা উত্তেজনার সৃষ্টি হওয়া চাই। সুস্থির জলরাশির মধ্যে একটা লোষ্ট্র ফেলিয়া দিলে যেমন উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, মোটামুটি সেইরূপ। সেই উত্তেজনা আবার তরঙ্গের মত চারিধারে ছড়াইয়া পড়িয়া আমাদের কাণে, স্নায়ুগুলিতে এবং মস্তিষ্কের কোনও কোনও কেন্দ্রে ধাক্কা না দিলে আমাদের চেতনা সাড়া দেয় না, আমরা শব্দ শুনি না। উত্তেজনা আবার অতিমৃদু বা অতিতীব্র হইলেও আমাদের শব্দ শোনা হয় না। স্পন্দনের বেগের (rate of vibration) একটা নিম্নসংখ্যা ও একটা উর্দ্ধসংখ্যা (lower limit and upper limit) আছে, এবং সেই দুইটি সীমার মধ্যের কোন অবস্থা না থাকিলে বাতাসের ঢেউগুলি সাধারণতঃ আমাদের শব্দজ্ঞান জন্মাইবে না। পরীক্ষা দ্বারা এ কথাগুলির প্রমাণ করা যায়। একটা বড় কাচের পাত্রের ভিতর বৈদ্যুতিক ঘণ্টা বাজিতেছে, আমি শুনিতেছি। যন্ত্র-সাহায্যে সেই পাত্রের বাতাস ধীরে ধীরে বাহির করিয়া যেমন ফেলা হইবে,

আমি ততই শব্দ কম শুনিতে থাকিব। পাত্র প্রায় বায়ুশূন্য হইয়া আসিলে আর আমি শব্দ শুনিতে পাইব না। অথচ ঘণ্টা তখনও পূর্ব্ববৎ দুলিতেছে। আবার ধীরে ধীরে বাতাস ভিতরে পুরিয়া দেওয়া হউক; আমিও আবার ক্রমশঃ বেশী বেশী শব্দ শুনিতে পাইতেছি। অতএব বাতাস শব্দের বাহন ইহাই সাব্যস্ত হইল। অন্বয়-ব্যতিরেকে আমরা দেখিলাম যে, ঘণ্টা-সঞ্চালন-সঞ্জাত স্পন্দন-গুলি বাতাস বহিয়া আনিয়া আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারে পৌঁছাইয়া না দিলে আমরা ঘণ্টাধ্বনি শুনিতে পাই না। শুধু দ্বারে পৌঁছাইয়া দিলেই তার খালাস নাই। শ্রবণযন্ত্র, স্নায়ুসূত্রসমূহ এবং মস্তিষ্কের অনুভূতিকেন্দ্র-গুচ্ছ-বিশেষে রীতিমত ভাবে ধাক্কা দিতে না পারিলে আমার শব্দজ্ঞান হয় না। ইহাও পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে। আবার, এ সকল উপাদান ও নিমিত্ত ছাড়া আরও একটা জিনিষের অপেক্ষা রহিয়াছে—সেটা অল্প বিস্তর মনঃসংযোগ। একটার তোপে যেদিন আমার ঘড়ি মিলাইতে হইবে সেদিন আমায় উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিতে হয়। ইহা হইল ইচ্ছাকৃত মনঃসংযোগ। অন্ধকারে কুটীরের গবাক্ষে বসিয়া শ্রাবণের বর্ষার সুরের মূর্চ্ছনা ও লয়গুলি শুনিতেছি এবং প্রথামত 'বাতায়নিকের কথা'ই ভাবিতেছি, এমন সময়ে চপলা ঘনীভূত অন্ধকাররাশি 'শকলানি' করিয়া দিয়া চমকিল, এবং একটু পরেই গুরুগম্ভীর মেঘমল্লারের একটা ছন্দঃ বিপুল উচ্ছ্বাসে নামিয়া আসিয়া বর্ষার সকল কোমল সুরগুলিকে মগ্ন করিয়া দিল। সকল ভাবনার মধ্য হইতে জাগিয়া আমায় এ শব্দ শুনিতেই হইয়াছে। ইহা হইল অনিচ্ছাকৃত মনঃসংযোগ। এস্থলে ধাক্কা এতই প্রবল যে আমায় শুনিতেই হয়। কিন্তু চাহিয়া দেখি, এই অমাবস্যায়, 'ঘোর বাদরে' আমার কুটীরে যিনি আজ অতিথি, তাঁহার নাসাগর্জ্জন পূর্ব্ববৎই চলিতেছে। ধাক্কা তাঁহাকে জাগাইতে পারে নাই। তাঁহার মনঃ-

সংযোগ হয় নাই। অতএব শুধু বাহিরে বাতাসের স্পন্দনই যথেষ্ট নয়, আরও অনেক উপাদান ও নিমিত্তের অপেক্ষা রহিয়াছে।

একটা ধাতুপাত্রে বাড়ি দিলাম। ঝন্ ঝন্ করিয়া উঠিল। ক্রমশঃ কিন্তু শব্দটা মৃদু হইতে মৃদুতর হইয়া চলিয়াছে। শেষকালে আর কিছুই আমি শুনিতে পাইতেছি না। ধাতুপাত্রের কণিকাগুলি কিন্তু তখনও প্রহারের বেদনা ভুলিতে পারে নাই; তাহারা তখনও কাঁপিতেছে। কিন্তু কাঁপিলে কি হয়, সে কম্পন এত মৃদু, যে তজ্জনিত বাতাসের কম্পন আমার অনুভূতি জাগাইতে পারে না। কম্পন বেগের একটা নিম্নসংখ্যা আছে যার নীচে নামিয়া গেলে সাধারণতঃ আর আমরা শুনিতে পাই না। কিন্তু শুনিতে পাই না বলিয়া কম্পন বা স্পন্দনও যে থামিয়া গিয়াছে এমন নহে। কোনও একটা স্পন্দনের বেগ পূর্ব্বোক্ত অধঃসীমা (lower limit) ছাড়াইয়া উঠিলে তবে সাধারণতঃ আমাদের শোনার সম্ভাবনা হইয়া থাকে। এ ছাড়া কাণের ও মস্তিষ্কের রীতিমত উত্তেজনা চাই এবং অল্পবিস্তর মনঃসংযোগ চাই। সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সোজা কথায়, এক ক্ষণের মধ্যে অন্ততঃ বারকতক বায়ুকণিকাগুলির স্পন্দন না হইলে আমরা শুনি না। যেমন একটা অধঃসীমা আছে, তেমনি একটা ঊর্দ্ধসীমাও (upper limit) আছে; এক ক্ষণের মধ্যে স্পন্দন কয়েক সহস্রের চেয়ে বেশী দ্রুত হইলে হয়ত আমরা শুনিতে পাইব না। এই দুইটা সীমার মধ্যে অবশ্য নানান্ থাক্, সুতরাং শব্দের নানান্ পরদা, নানান্ বৈচিত্র্য। ঐ দুই সীমার মধ্যে কোন একটা বিশিষ্ট বায়ুস্পন্দনের ফল একটা বিশিষ্ট শব্দজ্ঞান। কোকিলের ডাক বাহিরে একপ্রকার বায়ুস্পন্দন; কাকের ডাক আর এক প্রকার।

আমাদের শব্দজ্ঞানের মোটামুটি বিবৃতি এইরূপ। আপাততঃ

হইতে একটা কথা পরিষ্কার হইল যে, এইরূপ শব্দ সৃষ্টির মূল বা জগতের আদি বলিয়া মনে করা চলিতে পারে না। এইরূপ শব্দের জন্য বায়ুস্পন্দন দরকার, কিন্তু গোড়ায় বায়ু কোথায়? ইহার জন্য শ্রবণেন্দ্রিয় ও মস্তিষ্ক চাই, কিন্তু গোড়ায় সেগুলি আছে কি? মনঃসংযোগ, শব্দসংস্কার প্রভৃতি অপরাপর নিমিত্তেরও অপেক্ষা রহিয়াছে, কিন্তু জগতের যখন সবে আরম্ভ, তখন এগুলিই বা পাইতেছি কোথায়? আমরা যেটাকে শব্দ বলিয়া অনুভব করিতেছি সেটা সৃষ্টিপ্রবাহের মূলে ছিল না, পরে দেখা গিয়াছে; বিভিন্ন কারণের সহকারিতায় এবং বিবিধ অবস্থার যোগাযোগে পরে বিকাশ পাইয়াছে। সৃষ্টির প্রথম উপক্রম যাহা হইতে তাহাকে যদি 'প্রাথমিক স্পন্দ' (primordial causal movement) এই নাম আমরা দিই, তবে আমরা যেটাকে শব্দ বলিতেছি সেটা প্রাথমিক স্পন্দ নহে। সেই প্রাথমিক স্পন্দের মূল উৎস হইতে নানা দিকে নানা ভাবে অভিব্যক্তি হইয়াছে ও হইতেছে—নানা ধারায় সৃষ্টির প্রবাহ হইতেছে। এই ধারাগুলিকে 'কার্য্যাভিব্যক্তি ধারা' (lines or streams of effectual manifestation) বলা চলিতে পারে। আমরা যে সকল রূপ দেখিতেছি, শব্দ শুনিতেছি, রস, গন্ধ ও স্পর্শ অনুভব করিতেছি, সুখ দুঃখের বেদনা পাইতেছি—সে সকল এইরূপ একটা একটা অভিব্যক্তির ধারা। মূল উৎসে যাহা রহিয়াছে তাহা রূপ, শব্দ, রস প্রভৃতি নহে, তাহাদের করণ চক্ষুঃ কর্ণ প্রভৃতিও নহে, তাহাদের গ্রহীতা মন বা বুদ্ধিও নহে; তাহা প্রাথমিক স্পন্দন মাত্র।

সৃষ্টির গোড়ার কথা অথবা শেষের কথা এখন আমরা আলোচনা করিব না। সৃষ্টির কি কোনও আদি আছে ও অন্ত আছে, অথবা তাহা অনাদি ও অনন্ত—এ সমস্যারও সমাধানের প্রয়াস আমরা আপাততঃ করিব না। বোধ হয় এ সমস্যার

সন্তোষজনক কোন সমাধান নাই-ও। সৃষ্টি ও লয়ের কথা বাদ দিলে 'প্রাথমিক স্পন্দ'কে শুধুই 'স্পন্দ' বলিতে হয়। আপাততঃ ইহা বলিয়া কাজ নাই যে, কোন একপ্রকার জাগতিক সুষুপ্তির পর এই জাগতিক জাগরণ, কোন একটা মহামৌনের পর এই বিশ্বকলরব, কোন একরূপ সাম্যাবস্থার পর এই বিচিত্র বৈষম্যের উন্মেষ। সোজাসুজি ভাবে বুঝিতে গেলেও আমাদের সকল প্রকার জানার (experience) মূলে যে ব্যাপারটা রহিয়াছে, সেটা স্পন্দ বলিয়া আমরা ধরিতে পারি। আমাদের রূপজ্ঞান, শব্দজ্ঞান, রসজ্ঞান প্রভৃতি সকল জানা ব্যাপারের গোড়ার কথা স্পন্দ—চাঞ্চল্য (stressing)। ঈথারে কোন স্থানে একটা চাঞ্চল্য জন্মিল; সেটা তরঙ্গের মত চারিদিকে ছড়াইয়া আসিয়া আমার চক্ষু ও মস্তিষ্ককে চঞ্চল করিয়া দিল; এই চাঞ্চল্যের (stress) আমার চেতনায় যে প্রকাশ বা অভিব্যক্তি (resultant manifestation), তাহাই ত আমার বস্তুর রূপজ্ঞান। আলোক, তাপ, শব্দ প্রভৃতি সকল রকম অভিব্যক্তি সম্বন্ধেই এই বিবরণ খাটে। কোন একটি দ্রব্যের অণুগুলি অস্থির হইয়া কাঁপিতেছে; ঈথার বা তজ্জাতীয় কোন একটা অতীন্দ্রিয়, সূক্ষ্ম বাহন (medium) সে কম্পন বহন করিয়া আনিয়া আমার স্নায়ুগুলিকে উত্তেজিত করিয়া দিল; এই উত্তেজনার যে চেতনায় সাড়া (response), তাহাই ত আমার তাপের অনুভব। বাগবাজারের রসগোল্লা মুখে ফেলিয়া দিলাম; রসের সঙ্গে মুখামৃতের রাসায়নিক সংযোগ হইল; সেই রাসায়নিক ক্রিয়া দেখিতে গেলে শক্তির আদান প্রদান; তলাইয়া দেখিলে তাহা স্পন্দেরই ব্যাপার। রসনার স্নায়ুগুলি সেই শক্তির খেলায় চঞ্চল হইল। চেতনায় ইহারই যে ছাপ তাহাই আমার রসগোল্লার রসাস্বাদ। বাহন ঈথারই হউক, আর বায়ুই হউক, অথবা আর যাহাই হউক, তাহা লইয়া মারামারি করিয়া

লাভ নাই। সকল প্রকার অনুভূতির উৎপত্তি যে চাঞ্চল্যে (stir, agitation এ) সে পক্ষে আমরা সন্দেহ না রাখিলেও পারি।

অনুভূতি বা প্রত্যয়ের দিক্ হইতে দেখিতে গেলে যে সিদ্ধান্ত দাঁড়াইতেছে, অর্থ বা বিষয়ের দিক্ হইতেও সেই সিদ্ধান্তই আমরা পাই। কেমন করিয়া জানিতেছি শুনিতেছি, সে কথা না হয় ছাড়িয়া দেওয়া যাক্ ; জিনিষটা বস্তুতঃ কি ? দৃষ্টান্তের জন্য অপর আর একটা বাগবাজারের রসগোল্লা অদৃষ্টে যদি নিতান্ত নাই-ই যুটে, তবে না হয় এই নীরস খড়ির টুক্‌রাটি লইয়াই অগত্যা নাড়া চাড়া করা যাক্। দেখিতে এই খড়িটা বেশ জমাট বাঁধা একটা জিনিষ ; কিন্তু এখনি আমি ইহাকে চূর্ণ করিয়া ধূলিসাৎ করিয়া দিতে পারি। এই চূর্ণগুলি আবার আরও সূক্ষ্মতর অংশে বিভক্ত হইতে পারে ; রাসায়নিক বিদ্যা যাহাকে পরমাণু বলে সেইখানে গিয়া এইরূপ বিভাগের আপাততঃ বিরাম। কিন্তু আপাততঃ বিরাম, বস্তুতঃ নহে। কারণ, রাসায়নিক অণু পরমাণু-গুলিও যৌগিক দ্রব্য, তাহাদের গঠন প্রণালী জটিল। যে সূক্ষ্মতর উপাদানে সেগুলি গঠিত, সেগুলিকে বিজ্ঞান ইলেক্‌ট্রন (electron) বলিতেছে ; এগুলি তাড়িতের অণু ; ইহাদেরও মাপ পরিমাণ আছে, কিন্তু তাহা রাসায়নিক অণু (atoms) গুলির মাপের তুলনায় ঢের কম। একটা অণুর গঠন ব্যবস্থাও আবার কত জটিল, কত অদ্ভুত ! এক্ একটা অণুকে এক একটা বালখিল্য সৌরজগৎ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সৌরজগতে যেমন গ্রহ-উপগ্রহগুলি নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট পথে একটা কেন্দ্রের চারিধারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, আণবিক জগতে (atomic world) ও অনেকটা সেইরূপ। অণুতে পৌঁছিয়া আমরা আশা করিয়াছিলাম এইখানে বুঝি গতির বিশ্রাম, ছুটাছুটির শেষ ; বাহিরে অণু যতই চঞ্চল হইয়া ছুটিয়া বেড়াক না কেন, তার ভিতরটা সুস্থির। এই খড়িটার ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অংশগুলি নিয়ত দুলিতেছে,

কাঁপিতেছে, স্পন্দিত হইতেছে—আমরা চর্ম্মচক্ষে দেখিতে না পাইলেও হইতেছে। অণুগুলিতে পৌঁছিয়া আমরা ভাবিয়াছিলাম যে এগুলি পরস্পরের সম্পর্কে যতই চঞ্চল হউক না কেন, নিজের নিজের ভিতরে সুস্থির। কিন্তু ইলেক্‌ট্রন দেখা দিয়া আমাদের সে আশা ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। যেগুলিকে অণু বলিতেছি সেগুলিও যে এক একটা ক্ষুদ্র-ব্রহ্মাণ্ড, এক একটা জগৎ। স্থূল জগতে যেরূপ সঞ্চালন আবর্ত্তন, কম্পন স্পন্দন চলিতেছে, অণুর ভিতরকার জগতেও সেইরূপ। এ চলা ফেরার বিশ্রান্তি কোথায়? সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতরে ক্রমশঃ নামিয়া গিয়া কোথায় আবিষ্কার করিব একটা ধ্রুবলোক, একটা অচলায়তন? ইলেক্‌ট্রনে কি? ইলেক্‌ট্রনগুলি বাহিরে, অর্থাৎ পরস্পরের সম্পর্কে, বড়ই অশান্ত, চঞ্চল হইয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছে; সময়ে সময়ে তাদের গতি এতই ভীষণ হয় যে তাহা আলোক-তরঙ্গের গতির কাছাকাছি আসিয়া থাকে—অর্থাৎ এক সেকেণ্ডে প্রায় দুই লক্ষ মাইল। ইহাই হইল বাহিরের ব্যাপার। ইলেক্‌ট্রনের ভিতরটা কিরূপ? ইলেক্‌ট্রনের ভিতরের কথা ভাবিতে এখনও বিজ্ঞান সাহস পায় নাই; তাড়িত-অণুতে ব্রহ্মের 'অণো রণীয়ান্' মূর্ত্তির যে পরিচয় আমরা পাইয়াছি তাহাতেই আমাদের কল্পনাশক্তি মুগ্ধ ও স্তম্ভিত হইয়া রহিয়াছে; আরও সূক্ষ্ম, আরও ছোট ভাবিবার মত অবস্থা এখনও আমাদের হয় নাই। কিন্তু সত্যসত্যই ইলেক্‌ট্রনকে অণুত্বের পরাকাষ্ঠা (absolute limit) মনে করা চলিতে পারে কি? ইলেক্‌ট্রনও ত সাবয়ব দ্রব্য এবং তাহার একটা মাপও আছে; সুতরাং তার চেয়েও ছোট অংশ থাকারই সম্ভব; তাহারও কোন এক রকম দানা থাকারই কথা। যদি থাকে, তবে তাহারাও কি অস্থির, চঞ্চল নহে? এক একটা ইলেক্‌ট্রনকে এক একটা ঈথারের আবর্ত্ত ভাবিব কি? যদি তাহাই হয়, তবে ঈথারের সেই সূক্ষ্মতম অবয়বগুলি (ether-elements) ত চঞ্চল

হইয়া পাক দিতেছে। পুনশ্চ, ঈথারই বা কি এবং তাহার সূক্ষ্ম অবয়বগুলিই বা কি, এ সমস্যায় গণিত পরাভব স্বীকার না করিলেও আমাদের কল্পনা ভয়ে নিরস্ত হইয়া আসে।

গণিতের কল্পনা বস্তুতন্ত্রতার নাগপাশে বদ্ধ নয়; গণিত ঈথারকে কাটিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া যে সকল সূক্ষ্মতম অবয়ব (elements) তৈয়ার করিয়া লইয়াছে, এবং যেগুলির সাহায্যে জগতের চলাফেরা ব্যাপারের একটা ব্যাখ্যা দিবার প্রয়াস পাইতেছে, সেগুলিকে গণিতের পরিভাষা (mathematical concepts)র ভিতরেই আবদ্ধ করিয়া রাখিব, অথবা বাস্তব বলিয়া মনে করিব—এ সম্বন্ধে আপাততঃ বিতণ্ডা করিয়া লাভ নাই। সোজা কথায়, সূক্ষ্মের মধ্যে খুঁজিতে গিয়া আমরা শেষ পর্য্যন্ত সেই ঘোরা ফেরা, দোলা কাঁপাই পাইলাম। সূক্ষ্মের দিক্ দিয়া দেখিতে গিয়া পাইলাম স্পন্দ, চাঞ্চল্য। জগতে এমন কিছু ছোট নাই যার ভিতরে ও বাহিরে ছুটাছুটি নাই। যে চলিতেছে সেই জগৎ; অণুও চলিতেছে, সুতরাং অণুও জগৎ; ইলেকট্রনও চলিতেছে, সুতরাং সেও জগৎ; ব্যোমাংশ (ether-elements) গুলিও চলিতেছে, সুতরাং তারাও জগৎ। অতএব ব্রহ্মাণ্ডের গোড়ার কথা ও মর্ম্মের কথা এই চলাফেরা ব্যাপার। এই চলাফেরার নাম দিয়াছি স্পন্দ—ইহাকে সঞ্চলন (translation)ই বল, আর আবর্ত্তন (rotation)ই বল, অথবা ইহাদের বিবিধ সংমিশ্রণই বল। ছোটর দিক্ হইতে যে কথাটা পাইলাম, বড়র দিক্ হইতেও সেই কথাটাই পাই। আমাদের বসুন্ধরা চঞ্চলা; আমাদের সবিতা চঞ্চল; আমাদের ধ্রুবলোকও চঞ্চল। কেহ বা বেশী, কেহ বা কম। যাহাকে স্থির ভাবিতেছি সে কেবল মোটামুটি ভাবে দেখিতে গেলেই স্থির, বস্তুতঃ নহে। কোন স্থানেই বিশ্রান্তি ঐকান্তিক নহে, কোথাও নিরতিশয় ভাবে সুস্থিরতা (absolute rest) নাই। ব্রহ্মের যে 'মহতো মহীয়ান্' মূর্ত্তি সেও যে মহানটরাজের মূর্ত্তি, শান্ত সমাহিত মূর্ত্তি নহে।

জগতের সংহারের ভার যে ঠাকুরটির উপর, তাঁর ভাঙ্গের নেশা করিয়া তাণ্ডব-নৃত্য করার একটা বাতিক আছে শুনিয়াছি ; কিন্তু যে দেবতা আধারকমলে বসিয়া শব্দব্রহ্মরূপে এই নিখিল সৃষ্টিটাকে—বেদ ও বেদ্য উভয়কেই—'নিঃশ্বসিত' করিতেছেন, তাঁর 'জ্ঞানময়ং তপঃ' শুনিয়া ভাবিয়াছিলাম, বুঝিবা বিশ্বাত্মার সমাধির শান্ত, মগ্ন ভাবই এ সৃষ্টির গোড়ার কথা ; কিন্তু এখন দেখিতেছি, সে ত বাহিরকে গুটাইয়া আনিয়া ভিতরে আত্মস্থ করার সমাধি নয়, সে যে ভিতরের বাহিরে নিজেকে ছড়াইয়া দিবার বিপুল প্রয়াস, বিরাট আয়োজন ; সে যে একের বহু হইবার জন্য গভীর প্রসব-চাঞ্চল্য। তাই সৃষ্টিকর্তার অক্ষসূত্র, কমণ্ডলু প্রভৃতি তপস্যার অত আয়োজন দেখিয়া সৃষ্টির গোড়ার কথাটা যেন ভুলিয়া না যাই। আর যে দেবতাটি এই, 'আজব কারখানা' তদারক করার ভার লইয়াছেন, তাঁর হাতে নিয়ত চলিষ্ণু চক্রটার পানে তাকাইলে আর আমাদের ভুল হইবে না, কেমন করিয়া ও কিসের জোরে এত বড় কারখানাটা চলিতেছে। তাই বলিতে-ছিলাম, চলাই জগতের গোড়ায়, চলাই জগতের মাঝে এবং চলাই জগতের শেষে।

জগতে সবই চলিতেছে, কিন্তু অচল কি কিছুই নাই ? অচলের সঙ্গে না মিলাইলে কি সচলকে সচল বলিয়া ধরা যায় ? চলিতেছি যে, ইহা বুঝিতে ও মনে করিতে কোন কিছু একটা অচলায়তন আমাদের ঠিক করিয়া লইতে হয়। সকল সচলকে বুকে ধরিয়া নিজে অচল রহিয়াছে এমন কোন ভূমি বা আয়তন (absolute frame of reference) আছে কি ? যদি থাকে, তবে সেটা কি ? বেদ যাহাকে চিদাকাশ বলিয়াছেন তাহাই কি ? অথবা অপর কিছু ? এ প্রশ্নেরও আপাততঃ জবাব দিবার চেষ্টা করিব না। তবে একটা কথা বলিয়া রাখা ভাল যে, শ্রুতি বা আর্যবিজ্ঞান এই বিপুল চঞ্চল জগৎটাকে একটা শাশ্বত, সুস্থির ভূমিতেই প্রতিষ্ঠিত করিয়া

রাখিয়াছেন ; সুতরাং এ হিসাবে আমাদের অনুভূতির অচল (quiescent), সচল (stressing) এই দুইটা দিক্ রহিয়াছে। এই দুইটা দিক্ জড়াইয়া লইয়া তত্ত্ব (Fact) ; একটা দিক্ বাদ দিয়া অপর দিক্‌টা লইলে তত্ত্বের ভগ্নাংশ মাত্র আমরা পাই (Fact-section)। তবে আপাততঃ এ কথার এই পর্য্যন্তই।

অপিচ, স্পন্দ বলিতে শুধু জড়ের চলাফেরাই যেন না বুঝি। জড় মানে এ স্থলে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মূর্ত্ত দ্রব্য (matter)। গ্রহ নক্ষত্রগুলি ছুটিতেছে, ঈথারে বা আকাশে অণুগুলি, ইলেক্‌ট্রনগুলি দৌড়াইতেছে —এ সমস্ত চলাফেরা জড়ের চলাফেরা (motion)। কিন্তু বাগ্‌বাজারের রসগোল্লা খাওয়ার পর মনে এক ঘটি জল খাইবার ইচ্ছা হইল ; মন একটা অবস্থা হইতে আর একটা অবস্থায় পরিণত হইতেছে ; মনের যে এই প্রকার পরিণতি (becoming) তাহা ত রসগোল্লার, হাত হইতে মুখবিবরে আসার মত ঠিক নহে ; মন একদেশ হইতে অপরদেশে ঠিক যাইতেছে না ; ইহা ঠিক দৈশিক বা স্থানিক পরিবর্ত্তন (change of configuration) নহে। বালকের মন দ্বিতীয় ভাগের 'ঐক্য বাক্য মাণিক্য' ছাড়িয়া রাস্তায় যে লাটিম ঘুরিতেছে বা আকাশে যে ঘুড়ি উড়িতেছে তার দিকে গেল ; এ যাওয়া কিন্তু গুরুমহাশয়ের বেত্রদণ্ডের সন্নিধানে বসিয়াই হইতেছে। জড়-দ্রব্যের মতও মনের চলাফেরা হয় কি না, সে কথার এখানে আলোচনা করায় লাভ নাই। ভাবের বহিঃসঞ্চার (thought-transference) যথার্থ হইতেও পারে, তবে এখানে আমরা যে পার্থক্যের কথা বলিতেছি তাহা স্মরণ রাখাই ভাল। জড় মানে যদি দৃশ্য বা জ্ঞেয় পদার্থ মাত্রই হয়, তবে স্পন্দ বা চাঞ্চল্য জড়েরই ধর্ম্ম, চৈতন্যের নয়, এ কথা বলিতে পারা যায় ; কিন্তু জড় মানে যদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড়দ্রব্য হয়, তবে 'স্পন্দ' শব্দটাকে শুধু জড়েতেই আবদ্ধ করিয়া রাখিলে চলিবে না। জগতের গোড়ার কথা যে স্পন্দ তাহা শুধু জড়েরই স্পন্দ

নহে। জগতের গোড়ায় একটা বিরাট নীহার সমুদ্রের (nebula) কণিকাগুলি কাঁপিতেছিল, ছুটিতেছিল, তা ছাড়া আর কিছুই ছিল না —শুধু ইহা আমরা বলিতেছি না। আমরা অমনধারা জড়বাদী হইতে বাধ্য নই।

এই স্পন্দ, চাঞ্চল্য অথবা বিক্ষোভই শব্দ, যে শব্দ হইতে জগৎ চলিয়াছে। আমরা সচরাচর যাহাকে শব্দ বলি তাহা এই মৌলিক ও বিশ্বপ্রসূ বাকেরই এক প্রকার বিশিষ্ট অভিব্যক্তি (one stream of effectual manifestation)। এই প্রকার বিশিষ্ট অভিব্যক্তি হইতে হইলে যে সমস্ত উপাদান ও নিমিত্তের অপেক্ষা থাকে তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। মৌলিক, স্পন্দাত্মক শব্দের নাম দেওয়া হউক পরশব্দ; আর যে শব্দ আমরা বা আমাদের মত ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট জীবেরা কাণে শুনিতেছি, সেটার নাম দেওয়া হউক অপরশব্দ, অথবা শুধুই শব্দ। পরশব্দ হেতুভূত, অপর শব্দ কার্য্যভূত; পরশব্দ বা চাঞ্চল্য হইতেছে বলিয়াই আমরা শব্দ শুনিতেছি—ট্রামের ঘণ্টার রেণুগুলি কাঁপিতেছে, বাতাসকে কাঁপাইতেছে এবং আমাদের স্নায়ুমণ্ডলীকে কাঁপাইতেছে বলিয়াই আমরা ঘণ্টাধ্বনি শুনিতেছি। অপর শব্দ অভিব্যক্ত শব্দ; কতকগুলি সহকারি কারণ ও অবস্থার যোগাযোগ হইলে তবে পরশব্দ অপরশব্দরূপে অভিব্যক্ত হইবে, নতুবা হইবে না। কিন্তু সেরূপ ভাবে অভিব্যক্ত হউক আর নাই হউক, পরশব্দের পরশব্দত্ব তাহাতে ব্যাহত হয় না। হিমালয়ের কোন জনসম্পর্ক-শূন্য এক স্থানে একটা জলপ্রপাত শিলার উপর ভাঙ্গিয়া পড়িয়া ধ্বনি প্রতিধ্বনিতে পর্ব্বতমালাকে হয় ত চির-সজাগ করিয়া রাখিয়াছে; এ ক্ষেত্রে জলকণিকাগুলির কম্পন, বাতাসের কম্পন প্রভৃতি সচলতার, স্পন্দনের আয়োজন খুবই প্রচুর রহিয়াছে সন্দেহ নাই; কিন্তু শুনিবার কাণ যদি সেখানে না থাকে, তবে সে বিপুল চাঞ্চল্য, ভৈরবগর্জ্জনরূপে আর নিজেকে অভিব্যক্ত করিতে পারে

না। এ স্থলে পরশব্দ রহিয়াছে কিন্তু অপরশব্দ বা শ্রাব্যশব্দ নাই। বাতাস, শ্রবণেন্দ্রিয়, মনঃসংযোগ প্রভৃতি নিমিত্ত বা সহকারি কারণ না পাইলে পরশব্দ শুধু চাঞ্চল্যরূপেই থাকিয়া যায়, শ্রবণগ্রাহ্য শব্দ রূপে উপস্থিত হয় না। চন্দ্রমণ্ডলে নাকি বায়ু নাই; অগ্ন্যুৎপাতে চন্দ্রমণ্ডলের কোন অংশ ভীষণ ভাবে ফাটিয়া গেল; আমাদের পৃথিবীর অথবা মঙ্গলগ্রহের কোন বৈজ্ঞানিক কাণ খাড়া করিয়া বসিয়া আছেন; কিন্তু কিছুই শুনিতে পাইলেন না। কারণ, শব্দ এতই অভিজাত ব্যক্তি যে বাহন ছাড়া এক পাও চলেন না; এ ক্ষেত্রে বাহনের, অর্থাৎ বাতাসের অভাব। এ দৃষ্টান্তেও পরশব্দ রহিয়াছে কিন্তু অপরশব্দ নাই। অতএব অপরশব্দ ও পরশব্দ এ দুটা আমরা যেন গুলাইয়া না ফেলি। অপরশব্দ বা ধ্বনি যেখানে রহিয়াছে সেখানে পরশব্দ বা চাঞ্চল্য মূলে থাকিবেই; কিন্তু পরশব্দ থাকিলেই যে আমরা বা অপর কেহ ধ্বনি শুনিতে পাইব, এমন কোন ধরাবাঁধা ব্যবস্থা নাই। যেখানে শুনিতে পাই সেখানে সহকারি কারণগুলি বিদ্যমান; যেখানে পাই না, সেখানে স্পন্দ হয় ত রহিয়াছে, কিন্তু সহকারি কারণগুলি রীতিমত ভাবে নাই।

সহকারি কারণগুলি শুধু থাকিলেই হইল না, রীতিমতভাবে থাকা চাই। কারণ বা হেতুগুলির রীতিমত ভাবে থাকার নাম আমাদের দেশী পরিভাষায় যোগ্যতা। কাজেই, হেতু বা নিমিত্তগুলি রীতিমত ভাবে না থাকিলে স্পন্দ বা চাঞ্চল্য শ্রবণযোগ্য হয় না। যে পরশব্দ শ্রবণযোগ্য নয় তাহাকে এখনি অশ্রাব্য শব্দ বলিয়া ফেলিতে লোভ হইতেছিল; তবে, এই নীরস, কঠিন কথা পাড়িয়া একে আপনাদের সহিষ্ণুতার সীমা পরীক্ষা করিতে হইতেছে, তার উপর কথাগুলা যদি আবার অশ্রাব্য হয়, তবে হয় ত আপনারা কাণে আঙুল দিয়া উঠিয়া পড়িবেন; সুতরাং শব্দের শ্রাব্য ও অশ্রাব্য এরূপ দ্বৈবিধ্য পরিহার করিয়া, পরশব্দ ও অপরশব্দ এইরূপ দ্বৈবিধ্য লইয়াই আমায় সন্তুষ্ট

থাকিতে হইতেছে। পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিয়াছি, স্পন্দ বা চাঞ্চল্য যেমন তেমন হইলে আমাদের কাণে তাহা শব্দরূপে ধরা দেয় না। অণুপরমাণু-গুলির চলাফেরা আমি শুনি না। চিনির ঢেলা জলে ফেলিয়া দিলাম। চিনি জলে গুলিয়া যাইতেছে। শর্করা-কণার জলে ছড়াইয়া পড়া আমি শুনিতে পাই না, যদিও সে শর্করা মিশ্রিত জল অপর একটা বাচাল ও সরস ইন্দ্রিয়ের সম্পর্কে আসিলে আমার যে কেবল পিপাসা মিটে এমন নহে, প্রাণটাও মিঠা হইয়া যায়। অণুর মধ্যে ইলেক্‌ট্রনদের একটা চঞ্চল জগৎ আছে; কিন্তু আমার কাছে সে জগতের ভাষা নাই। জীবের জীবনকোষের (cell) মধ্যে প্রোটোপ্ল্যাজ্‌ম পাক দিতেছে (rotation of protoplasm); নিদাঘ মধ্যাহ্নে বনস্থলী যখন নীরব তখন পাদপ-রাজির পাতায় পাতায় জৈব পদার্থের নৃত্যশব্দ একটা মহামুখরতা রচনা করিয়া রাখিত, যদি সে শব্দ শুনিবার মত কাণ আমাদের থাকিত; বহুদিন হইল অধ্যাপক হক্সলি আমাদের সে বিপুল জীবন-সঙ্গীত শুনিতে নিমন্ত্রণ করিয়া রাখিয়াছেন। আপাততঃ সে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আমাদের সাধ্য নাই। অভ্যুদয় বাদ (Evolution theory) এর কল্যাণে আমাদের কর্ণের দৈর্ঘ্য বাড়িয়া গেলে বড় সুবিধা হইবে না, তবে শ্রবণশক্তির বিস্তার যদি বাড়িয়া যায়, তবে না হয় একদিন আচার্য্য মহাশয়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আমরা সবান্ধবে যাইব। ম্যাক্সওয়েলের ভূত তাপবিজ্ঞানের সমীকরণের একটা ভয়ানক শক্ত আঁক কষিয়া ফেলিয়াছে; এবং চঞ্চল জগতের অণুগুলিকে লইয়া দুইটা কামরায় আপন হিসাব মত বিলি করিয়া যাইতেছে; আমাদের সতর্কদৃষ্টি আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর বাঁচিয়া থাকিতে সেই বৈজ্ঞানিক ভূতটার সঙ্গে আমাদের মোলাকাৎ করিয়া দিয়াছিলেন। ভরসা করি, যেদিন বৈজয়ন্তধাম হইতে রথ নামিয়া আসিয়া আমাদের রামেন্দ্রসুন্দরকে বিশ্বোত্তীর্ণ পদবীতে, সত্যলোকে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছে, সেদিন তাঁহার আত্মা অব্যাহত, অনাবিল দৃষ্টিতে সেই ভূতটার

হিসাবের খাতাখানাই যে বেশ করিয়া দেখিয়া গিয়াছেন এমন নহে, তার এলাকাভুক্ত চঞ্চল জগৎটাকে বাঙ্ময়জগৎ, শব্দময় জগৎ রূপেও চিনিয়া গিয়াছেন। আমাদের কাছে অণুর জগৎ এখন পর্য্যন্ত শুধুই চঞ্চল জগৎ—তাহার ভাষা নাই।

আর দৃষ্টান্ত লইয়া কাজ নাই, কথাটা দাঁড়াইতেছে এইরূপ। মনেই হউক আর জড়েই হউক, ইলেক্‌ট্রনেই হউক আর গ্রহ উপগ্রহেই হউক, চেতনাতেই হউক আর জীবকোষেই হউক, যে কোন প্রকার স্পন্দ বা চাঞ্চল্যকে আমরা পরশব্দ বলিব। সে শব্দ আমরা শুনিতে পাই আর নাই-ই পাই। যদি পাই তবে তাহাকে অপরশব্দ বা ধ্বনি (Sound) বলিব। যে চাঞ্চল্যে হরির শব্দজ্ঞান হয় না, তাহাতে হয়ত যদুর শব্দ জ্ঞান হয়। হরির চেয়ে যদুর কাণ তীক্ষ্ণ। কুকুর হয়ত মানুষের চেয়ে বেশী শুনিতে পায়; যে সব ক্ষেত্রে আমাদের শব্দানুভূতি নাই সেখানে হয়ত তার আছে; কুকুরের চেয়ে বেশী শুনিতে পায় এমন জীবও থাকিতে পারে। যন্ত্র সাহায্যে (megaphone, microphone প্রভৃতি) পিপীলিকার পদসঞ্চারও হয়ত আমরা শুনিতে পারি। 'যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলং'—সুতরাং যিনি যন্ত্র সাহায্যে সূক্ষ্মশব্দ শুনিতেছেন তিনি যোগী। যোগী অন্যপ্রকারও হইতে পারেন। হিন্দুদের অধ্যাত্মবিজ্ঞান যদি সত্য হয় তবে যে কোন ব্যক্তি সংযম প্রক্রিয়া (অর্থাৎ ধারণা ধ্যান সমাধি) দ্বারা সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম শব্দও শুনিতে পারেন। চাই কি অণু-পরমাণু, ইলেকট্রনদের চঞ্চলচরণে ছুটাছুটি তাঁর কাছে ভাষাহীন, নীরব না হইতে পারে। তবেই শ্রবণ সামর্থ্য (capacity of hearing) আপেক্ষিক (relative), তারতম্য বিশিষ্ট (variable) এবং অবস্থাধীন (conditional) হইতেছে। এ যোগ্যতা দেশ-কাল-পাত্রের অপেক্ষা করে। তুমি আমি সচরাচর যে শব্দ শুনি তাহাকে স্থূলশব্দ বলা যাক্। যন্ত্র সাহায্যে যে শব্দ শোনা যায় বা যোগী যে শব্দ শুনিতে পান তাহাকে

সূক্ষ্ম (subtle) শব্দ বলা যাক্। কিন্তু সব যন্ত্র এক রকম নয়, সকল যোগীর অনুভব সামর্থ্য তুল্য মূল্য নয়; সুতরাং সূক্ষ্মশব্দেরও নানান্ থাক্ (gradations) অবশ্যই হইবে। বৈজ্ঞানিক বা যোগীও শব্দকে ঠিকভাবে বা পূরাপূরি (perfectly ও unconditionally) শুনিতে পান না; কারণ তাঁরও শ্রবণসামর্থ্য যে আপেক্ষিক ও অবস্থাধীন। কাজেই প্রশ্ন উঠিতেছে—কোনও অবস্থায় শব্দের ঠিকভাবে, নিরতিশয়রূপে শোনা আছে কি? এমন কোনও শ্রবণসামর্থ্য আছে কি যাহা সম্পূর্ণ ও নিরতিশয় (perfect ও absolute)? সত্যসত্যই আছে কিনা জানিনা, তবে গণিতশাস্ত্রের নজিরে ধরিয়া লওয়া হউক যে সেরূপ একটা অনুভব সামর্থ্য আছে—এমন একটা জ্ঞানভূমি আছে যেখানে অন্য কোন উপাদান বা নিমিত্তের অপেক্ষা না করিয়াই আত্মা স্পন্দমাত্রকে শব্দরূপে যথাযথ ধরিতে পারে। বাতাস বা ঈথার থাকুক্ আর নাই থাকুক্ বস্তুর চাঞ্চল্য বা স্পন্দ যদি কোন চৈতন্যে যথাযথ বা নিরতিশয়ভাবে শব্দরূপে অভিব্যক্ত হয়, তবে শ্রবণশক্তির যে পরাকাষ্ঠা আমরা খুঁজিতেছিলাম তাহাই সেখানে পাইলাম। এই প্রকার যে শ্রবণ সামর্থ্য তাহাকে সার্ জন উড্রফ Absolute Ear বা নিরতিশয় শ্রবণসামর্থ্য বলিতেছেন। এই পারিভাষিক শব্দটাকে যদি আমরা আক্ষরিক অনুবাদ করিতে যাই, তবে হয়ত হাস্যাস্পদ হইব। নিরপেক্ষ কর্ণ বা নিরতিশয় কর্ণ, এইরূপ একটা অদ্ভুত কথা শুনিলে আমরা কেহই সহিষ্ণু থাকিতে পারিব না। কিন্তু পরিভাষা যাহাই হউক, জিনিষটা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার নয়। আমরা 'কর্ণ' বলিলে সাধারণতঃ যাহা বুঝি ইহা সেরূপ কর্ণ না হইতে পারে। আমরা দেখিয়াছি যে শব্দানুভবসামর্থ্য কম বেশী হইয়া থাকে; সুতরাং জিজ্ঞাসা করিয়াছি যে এ সামর্থ্যের পরাকাষ্ঠা কোথায়? কোনও ব্যক্তিবিশেষে এ সামর্থ্য নিরতিশয়ভাবে পরিসমাপ্ত হউক আর নাই হউক, 'পশ্যত্যচক্ষুঃ শৃণোত্যকর্ণঃ' এমন

ধারা কোনও একজন প্রজাপতি সত্যসত্যই থাকুন আর নাই থাকুন, আমরা গণিতশাস্ত্রের বা বিজ্ঞানের দৃষ্টান্তে যদি একটা অনুভব সামর্থ্যের বিরামস্থান, পরাকাষ্ঠা কল্পনা করিয়া লই, তবে তাহাতে আমাদের অজ্ঞেয়বাদী অথবা নাস্তিক বন্ধুর শিরঃসঞ্চালন করিবার যথেষ্ট কারণ নাই। বৃত্তের ভিতরে একটা বহুভুজ ক্ষেত্র আঁকিয়াছি ; যদি ক্ষেত্রের ভুজসংখ্যা ক্রমেই বাড়াইতে থাকি, তবে ক্ষেত্রের পরিমাণ বৃত্তের পরিমাণের ক্রমেই কাছাকাছি হইতে থাকে। এ অবস্থা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করি—আচ্ছা, বহুভুজ ক্ষেত্রটির ভুজসংখ্যা যদি অনন্ত করিয়া লওয়া যায়, তবে তাহার চৌহদ্দী বৃত্তের সঙ্গে শেষকালে মিলিয়া যাইবে না কি ? সত্যসত্যই হাতে কলমে কিন্তু কখনই দুইটিকে একান্তভাবে মিলাইয়া দেওয়া যায় না ; তবে পরীক্ষার জের কল্পনা সারিয়া লইতেছে। তুমি বৈজ্ঞানিক, অণুর কথা বলিতেছ ; তাহা কি তোমার সূক্ষ্মতা-ভাবনার একটা কল্পিত পরাকাষ্ঠা (conceptual limit) নহে ? ইলেক্‌ট্রনের কথা বলিতেছ, তাহাও যে তোমার সংজ্ঞার (unit charge of electricity) ঠিক লক্ষ্যার্থ, এ কথা কি তুমি হলফ করিয়া বলিতে পারিবে ? যে জিনিষের একটা বেশি-কমি আছে, ক্রমিকধারা (series) আছে, তাহারই একটা পরাকাষ্ঠা কল্পনা করিয়া লইবার আমাদের অধিকার আছে, এবং সেরূপ কল্পনা করিয়া লওয়ায় অনেক সময় আমাদের বোঝাপড়ায় বিশেষ সুবিধা হয় ; এরূপ কল্পনা করার অধিকার না দিলে ক্যাল্‌কুলাস্ নামক গণিত-শাস্ত্রটাই অসম্ভব হইয়া পড়িয়া থাকিত। যাহা হউক, অনুভব সামর্থ্যের নানান্ থাক্ দেখিয়া তাহার একটা পরাকাষ্ঠা আমরা কল্পনা করিতেছি, এবং সেইটারই নাম দিতেছি Absolute Ear. আমাদের শোনা অল্প, এ প্রকার শোনা ভূমা ; আমাদের শোনা প্রায়িক, এ প্রকার শোনা যথার্থ ; আমাদের শোনা সাপেক্ষ, এ প্রকার শোনা

ধারাগুলি সম্বন্ধেও আমরা এক একটা পরাকাষ্ঠা ভাবিয়া লইতে পারি ; তাহা হইলে Absolute Eye, Absolute Tongue প্রভৃতিও আসিতেছে। তবে মনে রাখিতে হইবে, এগুলি এক একটা শক্তি বা সামর্থ্যের পরাকাষ্ঠা মাত্র ; চোখ, কাণ, জিব ইত্যাদির মত স্থূল কোন দ্রব্য না হইতেও পারে।

(এরূপ কর্ণকে (Absolute Earকে) পারমার্থিক কর্ণ বলিব কি ? নাম যাহাই দেওয়া হউক, স্মরণ রাখিতে হইবে যে ইহা নিরতিশয় শ্রবণ সামর্থ্য। শুনিবার জন্য এই কর্ণের কেবল একটা হেতুর অপেক্ষা করিতে হয়—সেটি স্পন্দ বা চাঞ্চল্য। চাঞ্চল্য বা উত্তেজনা থাকিলেই এই কর্ণ শুনিতে পাইবে, এবং এমনভাবে শুনিতে পাইবে যে, সে শোনার চেয়ে খাঁটি ও বেশী শোনা আর কিছু হইতে পারে না। এই পারমার্থিক কর্ণ দ্বারা যে শব্দের অনুভব হয় তাহাকে সার্ জন উড্রফ শব্দতন্মাত্র বলিতেছেন। দর্শনশাস্ত্র ব্যবসায়ীরা এ ব্যাখ্যার যাথার্থ্য বিচার করিবেন ; সাহেবের মতে পারমার্থিক কর্ণ দ্বারা আমরা শব্দের বিশুদ্ধ ও নিরতিশয় মূর্ত্তিটি (sound as it is) গ্রহণ করিতে পারি। ইহা যেন শব্দের প্রকৃতি ; আর তুমি আমি, এমন কি বৈজ্ঞানিক ও যোগীও যে শব্দ শুনিতেছেন, সেটা অল্পবিস্তর শব্দের বিকৃতি—এ শব্দের বেশিকমি আছে, ভুলভ্রান্তি আছে ; কেহ বেশি শুনিল কেহ কম শুনিল ; আমি যেভাবে শুনিলাম, তুমি সেভাবে শুনিলে না ; আমি ভুল শুনিলাম, তুমি কতকটা ঠিক শুনিয়াছ ; আমি যেখানে আদৌ শুনিতে পাইলাম না, তুমি সেখানে কিছু শুনিলে ; এইজন্য ইহা শব্দের বিকৃতি। তবেই আমাদের লক্ষণানুসারে শব্দতন্মাত্র শব্দের প্রকৃতি হইল—শব্দের প্রকৃতি, শব্দের প্রসূতি নহে। অর্থাৎ শব্দতন্মাত্র এবং পরশব্দ এক জিনিষ নহে। পরশব্দ কারণীভূত (causal) চাঞ্চল্য (stress) মাত্র—যে চাঞ্চল্যের জন্য শব্দজ্ঞান হয় সেইটা

মাত্র ; সে নিজে শ্রুতশব্দ (sound) নহে। ইহা শব্দের প্রসূতি। কিন্তু শব্দতন্মাত্র শ্রুতশব্দ, তবে তাহা তোমার আমার কাণে শোনা শব্দ নয়, পারমার্থিক কর্ণে শ্রুত নিরতিশয় শব্দ। কাজেই শব্দ-তন্মাত্রও অপরশব্দের ভাগেই পড়িতেছে। তবে অবশ্য অপরশব্দ-গুলির সর্ব্বোচ্চ থাক্ বা পরাকাষ্ঠা শব্দতন্মাত্রে। তার নীচে নানান্ থাকের শব্দ রহিয়াছে; সেগুলিকে মোটামুটি দুইরূপ মনে করা যাইতে পারে। বৈজ্ঞানিকযন্ত্রসাহায্যে অথবা ধ্যান-ধারণা দ্বারা যে শব্দগুলি আমরা শুনিতে পারি, কিন্তু যেগুলিকে সচরাচর আমরা শুনিতেছি না, সেইগুলি সূক্ষ্মশব্দ ; তাহাদের পরাকাষ্ঠা শব্দতন্মাত্রে। আর সচরাচর কাণে আমরা যে শব্দগুলি শুনিয়া থাকি (যথা বাঁশীর শব্দ, বৃষ্টির শব্দ, মেঘের ডাক ইত্যাদি), সেগুলি স্থূলশব্দ। অতএব অপরশব্দের বা শ্রুতশব্দের (soundএর) মোটামুটি তিনটা বিভাগ পাইলাম—প্রকৃত প্রস্তাবে কিন্তু থাক্ (gradations) গণনাতীত ; যত রকমের কাণ তত রকমের শোনা ; দেশ-কাল-পাত্র বদ্‌লাইলেই শোনাও বদ্‌লাইয়া যায়। বিভাগ তিনটি এই :—শব্দতন্মাত্র (বা শব্দের প্রকৃতি) ; সূক্ষ্মশব্দ (অতীন্দ্রিয় বলিব কি ?) ; এবং আমাদের আটপৌরে স্থূলশব্দ (normal sound)। এ তিনটি ছাড়া এবং এ তিনেরই মূলে যে চাঞ্চল্যের বীজ রহিয়াছে, যেটা না থাকিলে কেহই শুনিতে পান না, এমন কি স্বয়ং প্রজাপতিও শুনিতে পান না, সেইটাকে আমরা আগাগোড়া পরশব্দ বলিয়া আসিতেছি। তিন রকম শ্রুতশব্দের জন্য তিন থাকের কর্ণ বা শ্রবণ সামর্থ্য আবশ্যক। শব্দতন্মাত্রের জন্য পারমার্থিক কর্ণ (Absolute Ear) ; সূক্ষ্মশব্দের জন্য দিব্যকর্ণ (yogik ear) ; এবং স্থূলশব্দের জন্য ভৌতিককর্ণ (normal ear)। ফলকথা, শব্দের দিক্ হইতে হিসাব লইলে আমাদের জগৎ প্রত্যয়ের পাঁচটা অবস্থা। অনুভবের যদি কোনও তুরীয় ভাব থাকে, যেখানে আদৌ ক্ষোভ বা চাঞ্চল্য নাই, তবে

সেটা অশব্দের অবস্থা; কারণ, চাঞ্চল্য না থাকিলে শব্দ থাকে না। তারপর চাঞ্চল্য রহিয়াছে কিন্তু শুনিবার কোনওরূপ কাণ নাই; ইহাই পরশব্দ। তারপর, চাঞ্চল্য রহিয়াছে এবং তাহা নিরতিশয়ভাবে শোনা হইতেছে; ইহাই শব্দতন্মাত্র। তারপর, চাঞ্চল্যটাকে আমাদের ভৌতিককর্ণ ধরিতে পারিতেছে না, কিন্তু দিব্যকর্ণ ধরিয়া ফেলিতেছে, ইহাই সূক্ষ্মশব্দ। সর্ব্বশেষে, চাঞ্চল্য ভৌতিককর্ণটাকেও উত্তেজিত করিয়া শব্দজ্ঞান জন্মাইতেছে। ইহাই স্থূলশব্দ।

একটা কথা, সকলপ্রকার শব্দের মূলে যে চাঞ্চল্য (stress) রহিয়াছে তাহাকে আদৌ 'শব্দ' বলিতেছি কেন? যখন সেটাকে শুনিলাম তখনই সেটা শব্দ, যখন শুনিতেছি না, তখন সেটা শব্দের সম্ভাবনা (possibility) মাত্র, শব্দ নহে। ঠিক কথা; কিন্তু পরশব্দকে শব্দ বলিবার কৈফিয়ৎ আমাদের একটা আছে। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ—আমাদের অনুভূতির এই পাঁচটা ধারা। এই পাঁচটাই আবার যে উৎস হইতে নির্গত হইতেছে তাহা পরশব্দ বা চাঞ্চল্য। চাঞ্চল্য যে গোড়ায় তাহা বুঝিতে পারিতেছি, কিন্তু সেটাকে রূপ, রস, প্রভৃতি আখ্যা না দিয়া শব্দ আখ্যা দিতেছি কেন? শব্দের এমন বিশেষত্ব কি আছে যাহাতে তাহাকেই সকলের মোড়ল করিয়া বসাইতে হইবে? পরশব্দ যে প্রকৃত প্রস্তাবে শব্দ (sound) নহে তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; কাজেই তাহাকে শব্দ বলিতে গেলে আমাদের অধ্যাস (impose) করিতে হয়। এক কারণের যদি অনেকগুলি কার্য্য থাকে তবে তার মধ্যে সবচেয়ে স্পষ্ট কার্য্যটিকে আমরা কারণের সঙ্কেত (symbol, sign) ভাবে গ্রহণ করিয়া থাকি। এ ক্ষেত্রেও তাহাই। হ্রদের সুস্থির জলরাশির কাছে দাঁড়াইয়া নীরবতা অনুভব করিয়াছি; জলে যে চাঞ্চল্য নাই, শব্দ হইবে কেন? আবার, পুরীর সমুদ্রতটে দাঁড়াইয়া বিপুল সিন্ধুগর্জ্জন শুনিয়াছি; শুনিব না কেন, লবণাম্বুরাশির ধারানিবদ্ধা তরঙ্গমালা যে বেলাভূমিতে নিয়তই আছড়াইয়া পড়িতেছে।

নীরবতা সুস্থিরতার সঙ্কেত, মুখরতা চাঞ্চল্যের সঙ্কেত। যেখানে শান্তি সেখানে মৌন; যেখানে ক্ষোভ, ছুটাছুটি সেইখানে কোলাহল। সাম্যাবস্থা, শান্তি বুঝাইতে মৌনের মত এমন স্পষ্ট সঙ্কেত কোথায় পাইব? বৈষম্য, অশান্তি, চাঞ্চল্য বুঝাইতে শব্দের মত এমন স্পষ্ট সঙ্কেত কি আছে? যেখানে রূপ দেখিতেছি, রসাস্বাদ করিতেছি, গন্ধ পাইতেছি, সেখানেও মূলে এক প্রকার না এক প্রকার চাঞ্চল্য আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু সে চাঞ্চল্য স্পষ্ট নহে—পরীক্ষায় ধরা পড়ে। হরিদ্বারে চণ্ডীর পাহাড়ে বসিয়া হিমালয়ের তুষারমণ্ডিত গোটা কয়েক চূড়া দেখিতেছি; অথবা মুশৌরির সেনা-নিবাস পর্ব্বতে বসিয়া সম্মুখে চিরতুষারাচ্ছন্ন গিরিশ্রেণীর কর্পূরকুন্দেন্দু-ধবল বিরাট বপুঃ নিষণ্ণ রহিয়াছে দেখিতেছি। এই যে রূপজ্ঞান, ইহার মূলেও ঈথারতরঙ্গগুলির বা ঐ রকম একটা কিছুর চঞ্চল অভিসার রহিয়াছে বটে, কিন্তু আমি তাকাইয়া দেখি যেন একটা বিপুল, ভাস্বর নিসর্গগৌরব চিত্রার্পিত হইয়াই রহিয়াছে—কোথাও একটু ক্ষোভ নাই, চাঞ্চল্য নাই; সব শান্ত, সমাহিত। এটা কিন্তু আমার দৃষ্টির স্বাভাবিক কৃপণতা, আমার বোঝার ভুল। অত সূক্ষ্ম চাঞ্চল্য আমার কাছে চাঞ্চল্য বলিয়া ধরা পড়ে না। মন্দিরে পূজায় বসিয়া দেবতার পায়ে একটা প্রস্ফুটিত পদ্ম নিবেদন করিয়া দিয়াছি; তার স্নিগ্ধ সৌরভ আমার ভাব আরও গাঢ় করিয়া দিতেছে। অবশ্য, গন্ধবহ পদ্ম-পরাগরেণু বহিয়া আনিয়া আমার নাসিকার ত্বকে ছিটাইয়া না দিলে আমি গন্ধ পাই না; কিন্তু গন্ধ পাইয়া, এত আহরণ, বিকিরণ ও বিতরণের কথা ত কৈ আমার মনে হয় না; আমি মনে ভাবি পদ্ম পরিমল যেন একটা স্নিগ্ধ শান্তি প্রলেপের মত আমার প্রাণের উপর লাগিয়া রহিয়াছে। এখানেও চাঞ্চল্য অনুভবে ধরা পড়ে না, পরীক্ষায় ধরা পড়ে। এই জন্য রূপ, রস প্রভৃতি চাঞ্চল্যহেতুক হইলেও চাঞ্চল্যের সব সময়ে স্পষ্ট প্রতীক নহে। কিন্তু শব্দ ও চাঞ্চল্য

যেন এপিঠ-ওপিঠ ; দেখিলে সন্দেহ বা ভ্রম থাকিতেও পারে, যেটা দেখিতেছি সেটা অস্থির কি সুস্থির ; কিন্তু ডাক শুনিলে আর সন্দেহই থাকে না, যে ডাকিতেছে সে অস্থির। তাই শব্দ চাঞ্চল্যের খুব স্পষ্ট ও অব্যভিচারী সঙ্কেত। কাণে বায়ুতরঙ্গের ধাক্কা অনেকটা ধাক্কার মতনই বোধ হয়, কিন্তু চোখে (retina) ঈথারতরঙ্গের ধাক্কা আমরা প্রায়ই ধাক্কা বলিয়া জানিতে পারি না।

শব্দের শক্তিও অদ্ভুত। অভিধাশক্তি, লক্ষণাশক্তি, স্ফোট প্রভৃতি লইয়া তার্কিকেরা মারামারি করুন, আমরা আপাততঃ ও দিকে ভিড়িব না। একটা মসৃণ কাচের উপর সূক্ষ্ম ধূলিরেণুসমূহ পড়িয়া রহিয়াছে। আমি নিকটে বসিয়া বেহালার একটা গৎ বাজাইতেছি। শব্দতরঙ্গগুলি ধূলিরেণুগুলিকে ধীরে ধীরে সাজাইয়া একটা নির্দ্দিষ্ট আকারে আকারিত করিয়া দিবে। শব্দের নিজের ছন্দের (harmony) অনুরূপ একটা মূর্ত্তি সৃষ্টি করার শক্তি রহিয়াছে। অতএব শব্দ শুধু চাঞ্চল্যের সঙ্কেত নহে; তার গড়িবার ভাঙ্গিবার শক্তি আছে। জগতে গড়াভাঙ্গা মানে চাঞ্চল্য ; শব্দও গড়িতে ভাঙ্গিতে পারে ; অতএব শব্দ চাঞ্চল্যের আত্মীয় ও প্রতিনিধি। রূপ বা রসের সত্য সত্যই বাহিরে একটা কিছু গড়িবার ভাঙ্গিবার শক্তির আমরা পরিচয় বড় একটা পাই না। ভিতরে রূপের বা রসের ভাঙ্গিবার গড়িবার শক্তি অস্বীকার করিতে আমার সাহস নাই। শব্দ স্পষ্টতঃ শক্তিস্বরূপ (dynamic) এবং স্রষ্টা (creative)। শুধু ধূলিকণা লইয়া নহে, অন্যান্য উপায়েও শব্দের এই স্বরূপ ও সামর্থ্য পরীক্ষিত হইতে পারে। ঊনবিংশ শতাব্দী ও বিংশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে আবিষ্কৃত রেডিয়াম (radium) নামক দ্রব্য নিয়তই তাপ বিকিরণ করিতেছে দেখা যায়। এ তাপের ভাণ্ডার যেন অফুরন্ত। আমরা জানি যে তাপ কোনও একটা বস্তুর অণুগুলির এলোমেলো ভাবে স্পন্দন মাত্র (irregular molecular

quiver) ; যে জিনিষের দানাগুলি ঐরূপ ভাবে কাঁপিতেছে সেই জিনিষটা আমাদের অনুভূতিতে গরম বলিয়া ঠেকে। রেডিয়াম অত তাপ পাইতেছে কোথায় ? ব্যাখ্যাটা বোধ হয় এইরূপ :— রেডিয়ামের পরমাণু (atoms) গুলি ফাটিয়া যাইতেছে ; বিজ্ঞানের পরমাণু সাবয়ব ও পরিমিত দ্রব্য মনে রাখিবেন। পরমাণুর টুক্‌রা-গুলিকে ইলেক্‌ট্রন বলা যাক্। সেই ইলেক্‌ট্রনগুলির কতক-কতক রেডিয়ামের ভিতর হইতে ভীষণ বেগে বাহিরে ছুটিয়া আসিতেছে ; কতক বা রেডিয়ামের অন্যান্য অণুতে ধাক্কা (collision) পাইয়া সে-গুলিকে কাঁপাইয়া দিতেছে। অণুগুলির এই প্রকার দোলনই তাপরূপে অভিব্যক্ত হয়। কতকগুলি সমিধ্ সাজাইয়া লইয়া শিক্ষা নামক বেদাঙ্গের ঠিক নির্দ্দেশ মত 'অগ্নিমীলে' প্রভৃতি বেদমন্ত্রগুলি উচ্চারণ করিতেছি। এই শব্দের মূলে যে স্পন্দ (vibration) রহিয়াছে সেটা যেমন বায়ুকে কাঁপাইয়া তোমার আমার শব্দজ্ঞান জন্মাইতেছে, সেইরূপ সমিধের দানাগুলিতেও ধাক্কা দিতেছে। সে ধাক্কা এরূপভাবে ছন্দোবদ্ধ যে, সে ধাক্কার ফলে সমিধের পরমাণুগুলি ফাটিয়া যাইলেও যাইতে পারে। পরমাণুর ভিতরে ইলেক্‌ট্রনগুলি একটা নির্দ্দিষ্ট বেগে ও রীতিতে ঘুরিতেছে ; তাদের ঘোরার একটা ছন্দঃ আছে (harmonic motion)। আমার উচ্চারিত মন্ত্রগুলির ছন্দঃ (অর্থাৎ শব্দতরঙ্গের ছন্দঃ) ইলেক্‌ট্রনের গতিচ্ছন্দের অনুরূপ অথবা অনুপাতী হইলে, তাহার সহিত সংযুক্ত (compounded) হইয়া তাহাকে উপচিত করিয়া তুলিতে পারে। দুইটা বেহালা যদি এক সুরে বাজান হয় তবে যেমনি সুরদ্বয়ের সংযোগ ও উপচয় হয়, সেইরূপ। এখন ইলেক্‌ট্রনগুলির বেগ, উপচয়ের ফলে যদি একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা (critical value) ছাড়াইয়া যায়, তবে তাহারা কক্ষচ্যুত হইয়া ছট্‌কাইয়া আসিবে। তারা কক্ষচ্যুত হইয়া ছট্‌কাইয়া গেলেই পরমাণু ফাটিয়া গেল ; গ্রহগুলি কক্ষচ্যুত হইয়া ছটকাইয়া

গেলে সৌরজগতের যেমন অবস্থা হইবে সেইরূপ। কক্ষচ্যুত গোটাকতক ইলেক্‌ট্রন অবশ্য প্রবলবেগে সমিধের দানাগুলিতে ধাক্কা দিবে এবং সেগুলিকে কাঁপাইতে থাকিবে। এ কম্পনের অভিব্যক্তি কিসে? তাপে। পুনঃ পুনঃ কিছুক্ষণ ধরিয়া এ ব্যাপার চলিলে তাপ ক্রমশঃ উপচিত হইয়া সমিধ্ জ্বালাইয়া তুলিতে পারে। এ ক্ষেত্রে মন্ত্রশক্তিতে সমিধ্ জ্বলিয়া উঠিল। রেডিয়ামের দৃষ্টান্তে এ কথাটাকে আর নিতান্ত গাঁজাখুরি বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না। ভাবিয়া দেখিতে হইবে এবং পরীক্ষা করিতে হইবে। পরীক্ষণীয় ব্যাপারে সুসংস্কার কুসংস্কারের কথা অবান্তর কথা—সেখানে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী উভয়কেই সাবধানে পথ হাতড়াইয়া চলিতে হয়।

(ইলেক্‌ট্রনগুলিকে নাড়াচাড়া করার সামর্থ্য যদি শব্দের থাকে (থাকা অসম্ভব নয়), তবে সেগুলিকে ছড়াইয়া সাজাইয়া শব্দ অনেক অঘটন ঘটাইতে পারে। ঈথারের দানাগুলি অথবা ইলেক্‌ট্রনগুলি সাজাইয়া গুছাইয়া শব্দ যে দেবতার তৈজসমূর্ত্তি গড়িয়া তুলিতে পারে, সে কথার ব্যাখ্যা আপনারা হীরেন্দ্রবাবুর কাছে পাইবেন। আরও এক কথা; জলীয় বাষ্পের, মেঘের দানা রূপে পরিণত হইবার পক্ষে এক একটা ঘনীভাবকেন্দ্র (centres of condensation) চাই, অন্ততঃ পাইলে সুবিধা হয়; কোনও একটা ইলেক্‌ট্রন বা অন্য সূক্ষ্ম জিনিষকে কেন্দ্রস্বরূপ না পাইলে জলীয় বাষ্প জমাট বাঁধিয়া জলকণায় পরিণত হয় না, সুতরাং মেঘও হয় না। এখন যদি আমরা ধরিয়া লই যে যজ্ঞীয় ধূম ছাড়া, মন্ত্রোচ্চারণ-জনিত শব্দ স্পন্দ-গুলি উপযুক্ত ভাবে ইলেক্‌ট্রন ছড়াইয়া দিয়া ঐরূপ ঘনীভাবের কেন্দ্র-সমূহ রচনা করিয়া দিতে পারে, তবে মন্ত্রশক্তির ফলে পর্জ্জন্য ও বৃষ্টি হওয়া বিচিত্র নহে। এ ক্ষেত্রেও ভাবিয়া দেখার কথা অনেক। প্রথমতঃ, শব্দের ইলেক্‌ট্রন পর্য্যন্ত পৌঁছিবার সত্য সত্যই সম্ভাবনা

আছে কি না; অভিব্যক্ত শব্দ (sound) যে বায়ুস্পন্দগুলি সৃষ্টি করিতেছে শুধু সেগুলির কথা বলিতেছি না; অভিব্যক্ত শব্দের মূলে যে চাঞ্চল্যাত্মক পরশব্দ রহিয়াছে সেটার কথাও ভাবিতে হইবে। হ্রীং বা ক্রীং উচ্চারণ করিতে যাইলে আমার ভিতরে প্রাণশক্তির পরিস্পন্দ প্রথমতঃ হয়; পরে তাহা উচ্চারণ যন্ত্রকে উত্তেজিত করিয়া বাতাসকে চঞ্চল করে; সেই বাতাসের চাঞ্চল্য শ্রবণেন্দ্রিয় প্রভৃতিকে চঞ্চল করিয়া তোমার ও আমার শব্দজ্ঞান জন্মায়। গোড়ায় সেই প্রাণশক্তির পরিস্পন্দ; আপাততঃ আরও তলাইয়া না হয় নাই-ই দেখিলাম। এখন প্রশ্ন এই—প্রাণশক্তি স্বরূপতঃ কি? তাহার স্পন্দ ঈথার অথবা ইলেক্‌ট্রন পর্য্যন্ত পৌঁছায় কি না? আবার, মন্ত্রশক্তি দ্বারা এ সকল অঘটন-ঘটনা যদি সম্ভবপর বলিয়া ধরিয়াও লওয়া হয়, তথাপি এ প্রশ্ন রহিয়া যাইবে—বেদোক্ত ও তন্ত্রোক্ত মন্ত্রগুলিই সেই মন্ত্র কি না? এগুলি ভাবিয়া দেখার কথা এবং পরীক্ষায় যাচাই করিয়া লওয়ার কথা। আমি এখানে গোটা কয়েক কথা প্রশ্নরূপে পাড়িয়া পরীক্ষা ও মননের জন্য একটা পতিত জমির দিকে সকলের দৃষ্টি-আকর্ষণ করিতেছি মাত্র। শেষ পর্য্যন্ত ব্যাখ্যাটা এরূপও হইতে পারে, অন্য প্রকারও দাঁড়াইতে পারে। বস্তুর মোটা মোটা দানাগুলিকে শব্দ যে সাজাইয়া গুছাইয়া লইতে পারে, তাদের একটা বিশিষ্ট আকার দিতে পারে, ইহা আমরা ইতিপূর্ব্বে একখানা ধূলিধূসরিত কাচের সম্মুখে বেহালার গৎ বাজাইয়া পরীক্ষা করিয়া লইয়াছি। অন্ততঃ এ সব পরীক্ষিত ক্ষেত্রেও আমরা শব্দকে স্রষ্টা (creative) বলিয়া চিনিতে পারিতেছি। এই জন্য বলিতেছিলাম শব্দ জগতের মৌলিক স্পন্দের (causal stress এর) খুবই উত্তম সঙ্কেত। আদি কারণের কার্য্য-প্রবাহরূপে, ব্রহ্মের জগৎরূপে আবির্ভূত হইবার যে উপক্রম ও অবস্থা, তাহাকে শব্দব্রহ্ম বলিলে বেশ সুসঙ্গতই হয়। ইহা যেন

একটা বিরাট্‌ সুষুপ্তির পর বিরাট্‌ জাগরণ; মহামৌনব্রত-ভঙ্গের পর প্রথম আলাপন। ইহার উপক্রম একটা চাঞ্চল্যে—"এক আমি, আমার আর এক থাকিলে চলিবে না, বহু হইতে হইবে," এইরূপ "ঈক্ষণে"। মৌনের অবস্থা অশব্দের অবস্থা; তারপর আদিম চাঞ্চল্যের যে প্রথমা বাক্‌ বা বাণীমূর্ত্তি তাহাই প্রণব। এ কথাটা পরে পরিষ্কার হইবে।)

সৃষ্টিটা প্রজাপতি মহাশয়ের সখের যাত্রা। তিনি দলের অধিকারী। তিনি যেই একদিন "এতে" এই শব্দ করিলেন, অমনি তেত্রিশ কোটি দেবতা যাত্রার দলের ছোক্‌রাদের মত সাজিয়া গুজিয়া আসরে আসিয়া অবতীর্ণ হইল। অতএব দেবতাসৃষ্টি শব্দপূর্ব্বিকা।—এইরূপ বেদের ব্যাখ্যা করার দিন আর নাই। শব্দব্রহ্ম মানে এ নয় যে একজন কেহ থাকিয়া থাকিয়া এক-একটা শব্দ করিতেছেন, আর এক-একটা পদার্থ সৃষ্টির আসরে আসিয়া হাজির হইতেছে। এ মোটা কথাটা ভিতরের সূক্ষ্ম কথার সঙ্কেত মাত্র। শব্দের সৃষ্টি-সামর্থ্য অসম্ভব নহে আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু প্রজাপতি যে শব্দ-সাহায্যে সৃষ্টি করেন তাহা কোন্‌ শব্দ? বেদে পুরাণে দেখিতে পাই যে প্রথমতঃ তাঁহার ধ্যানে বেদশব্দগুলি আবির্ভূত হন। বেদশব্দ বলিতে কি বুঝিব? এমন একটা শব্দ যাহার সহিত একটা নির্দ্দিষ্ট অর্থের এবং একটা নির্দ্দিষ্ট প্রত্যয়ের নিত্য সম্বন্ধ রহিয়াছে। 'গৌঃ' শব্দটা শুনিলাম; মনে নৈয়ায়িক মহাশয়ের দেওয়া লক্ষণ ও আকৃতিবিশিষ্ট একটা জন্তুর ছবি উদিত হইল; চাহিয়া দেখি সত্যই একটা গরু স্বচ্ছন্দমনে ঘাস খাইতেছে। প্রথমটা শব্দ, দ্বিতীয়টা প্রত্যয় এবং শেষেরটা অর্থ বা বিষয়। তোমার আমার কাছে এ তিনের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হইলেও পূরাপূরি নিত্য নহে। 'গৌঃ' শব্দটার মানে যদি আমার জানা না থাকে তবে তাহা শুনিয়া আমার বিশেষ কোনও প্রত্যয় বা

চিত্তবৃত্তি হইবে না। অপিচ 'গৌঃ' এই শব্দের বাচ্য বা অর্থ গরু নামক জন্তুটিরই যে হইতে হইবে এমন কোনও বাঁধাবাঁধি আইন নাই। আমরা পাঁচ জনে আজ হইতে পরামর্শ করিয়া, শুধু অসাক্ষাতে নয় সাক্ষাতেও, যদি পরস্পরকে 'গরু' বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করি, তবে আমাদের ঠেকায় কে? যাদের ভাষা বিভিন্ন তারা হয়ত গরুকে গরু বলে না, আর কিছু বলে; আমরাও ইচ্ছা করিলে গরুকে গরু না বলিয়া আর কিছু বলিতে পারি। কাজেই শব্দ ও অর্থ, বাচক ও বাচ্যের মধ্যে নিয়ত সম্বন্ধ কোথায়? শব্দ শুনিয়া প্রত্যয় বা চিত্তবৃত্তিও যে সকলের মনে একই রকম হয়, এরূপ নহে। 'গরু' এই শব্দ শুনিয়া আমার মনে পড়িল সেই শ্যামলা গাইটি, যার দুধ প্রসন্ন গোয়ালিনী বেচিয়াই মরিত কখনও খাইত না, এবং যার সাক্ষ্য দিতে স্বয়ং কমলাকান্তকে কাট্‌গড়ায় দাঁড়াইতে হইয়াছিল; তোমার হয়ত মনে পড়িল কৈলাসের সেই বৃষরাজ যিনি দেবাদিদেবের রজতগিরিনিভ বপুটি বহন করিয়া স্থাবরজঙ্গমের সর্ব্বত্র হেলিয়া দুলিয়া বেড়াইতেছেন। প্রত্যয় ঠিক একরূপ হইল না। কাজেই আমাদের ব্যবহৃত কোন শব্দ একটা নির্দ্দিষ্ট প্রত্যয় মনে জাগাইতে পারে, অথবা না-ও পারে; তার একটা চিরনির্দ্দিষ্ট বাচ্য বা অর্থ থাকিতেও পারে, না-ও থাকিতে পারে। শব্দ, অর্থ ও প্রত্যয়ের সম্পর্ক আমরা ভবিষ্যতে বিশেষভাবে আলোচনা করিব। এখন প্রশ্ন এই—প্রজাপতি ধ্যানে যে বেদশব্দ পাইলেন তাহাও কি এই জাতীয়? উত্তর পাইতে হইলে কয়টা কথা আমাদের পরিষ্কারভাবে মনে রাখা চাই। (প্রথম, প্রজাপতি বা ব্রহ্মার মনে সৃষ্টি করার ইচ্ছা বা সিসৃক্ষা, সেটা আদৌ শব্দ নহে; সেটা চাঞ্চল্যাত্মক, উন্মেষাত্মক পরশব্দ মাত্র। আমরা বার বার বলিয়া আসিতেছি, ইহাই সৃষ্টির গোড়ার কথা ও মর্ম্মের কথা। তার-পর ধ্যানে বেদশব্দগুলির আবির্ভাব। এ শব্দগুলি শব্দতন্মাত্র।)

প্রজাপতি ধ্যানে যে শব্দ শুনেন তাহা সেই নিরতিশয় শব্দ যাহার কথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তাঁহার কর্ণ পারমার্থিক কর্ণ (absolute ear)। আমাদের, এমন কি যোগীদেরও ঠিক সে শব্দ শোনার সম্ভাবনা নাই। আমি যে শব্দটিকে 'গৌঃ' রূপে শুনিতেছি, প্রজাপতির কর্ণে তাহার শোনা নিশ্চয়ই অন্যরূপ। তাঁহার যে শোনা তাহাই 'গৌঃ' এই শব্দের প্রকৃতি, তোমার আমার শোনা সে শব্দের অল্পবিস্তর বিকৃতিমাত্র। যোগী সেই খাঁটী শব্দের কাছাকাছি যান, কিন্তু স্বয়ং প্রজাপতির ভূমিতে না উঠিতে পারিলে, তাঁহারও ঠিক খাঁটী শব্দ শোনা হয় না। প্রণব, ঐঁ, হ্রীং, ক্রীং প্রভৃতি শব্দ আমরা যেভাবে শুনি বা বলি সেটা তাদের প্রকৃতি নহে, বিকৃতি। যতই উপরের থাকে (plane) উঠিব, ততই শব্দগুলি স্ব স্ব প্রকৃতির অনুরূপ হইয়া আসিবে। একটী বর্ত্তিকা হইতে আলোকরশ্মি বিভিন্ন স্তরের বাহনের (medium) ভিতর দিয়া আমার চোখে আসিয়া পড়িতেছে; ধর, স্তরগুলি ক্রমশই জমাট্ (dense) হইয়া আসিয়াছে; এ অবস্থায় রশ্মি ঠিক সরলভাবে আমার চোখে পৌঁছিবে না, বাঁকিয়া চুরিয়া, ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া আসিবে। ইহাই রশ্মির বিকার (refraction)। শব্দের বেলাও যে অনেকটা এইরূপ তাহা আমরা প্রবন্ধান্তরে বিশেষভাবে দেখাইতে চেষ্টা করিব। প্রজাপতি তাঁহার পারমার্থিক শক্তির দ্বারা যে শব্দ উচ্চারণ করিতেছেন ও শুনিতেছেন, তাঁহার মানসপুত্র সনৎকুমার অবিকল সেইটি উচ্চারণ করিতে ও শুনিতে পারেন না—তাঁহার বলা ও শোনা ঈষৎ বে-ঠিক হয়, কারণ তিনি যে প্রজাপতির এক থাক্ নীচে। আবার সনৎকুমারের পর যিনি বলিলেন ও শুনিলেন তাঁহার আরও একটু দোষ হইল। এইরূপে গুরুপরম্পরায় নামিয়া আসিয়া সেই আদিম শব্দমালা যখন আমার রসনায় ও কর্ণে পৌঁছিল, তখন তাহাদের নিরতিশয়তা অপগত

হইয়াছে, স্বাভাবিকতা অনেকটা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অতএব ব্রহ্মার ধ্যানে যে বেদশব্দ প্রকাশ পাইয়াছে তাহা তোমার আমার শ্রুত ও উচ্চারিত শব্দগুলির সঙ্গে হুবহু মিলিয়া যাইতে পারে না। নানা কারণে আমাদের থাকে আসিতে আসিতে শব্দের সঙ্কর ও বিকার হইয়াছে। এ কথার আলোচনাও পরে হইবে। তবে গুরুপারম্পর্য্য থাকাতে, সাঙ্কর্য্য (confusion) ও বিকৃতি (degeneration) যতটা হইতে পারিত, ততটা হয় নাই। প্রত্যেক গুরুই প্রয়াস পাইয়াছেন তাঁহার শিষ্যকে ঠিক নিজের শব্দসম্পদ্ অক্ষুণ্ণভাবে বহিয়া দিতে; এই কাণ্ডটাই বেদের প্রথম অঙ্গ—শিক্ষা। শিষ্যের শিক্ষার ব্যবস্থায় ইহার প্রথম স্থান। সর্ব্বদাই যথাযথভাবে শব্দধারা পাইতে ও বহাইয়া দিতে গুরুশিষ্যপরম্পরা সচেষ্ট ছিলেন ও আছেন। এ চেষ্টা না থাকিলে আরও বিকৃতি ও গোলযোগ হইত। পার্শ্বস্থ চিত্রে 'কখ' রেখা দ্বারা যদি আমরা শব্দের প্রকৃতি (pure, normal transmission) বুঝাই, তবে অপর দুইটি 'কগ' ও 'কঘ' বক্ররেখার মধ্যে মাঝেরটি গুরুপরম্পারায় শব্দসন্ততি (transmission of sounds) বুঝাইতেছে এবং বাহিরের বক্ররেখাটি গুরুপরম্পরা না থাকিলে যতটা বিকৃতি হইতে পারে তাহাই বুঝাইতেছে। সমান্তরাল রেখাগুলি (horizontal lines) দ্বারা বিভিন্ন থাকের অনুভব সামর্থ্য দেখান হইয়াছে।

শব্দের বিকৃতি

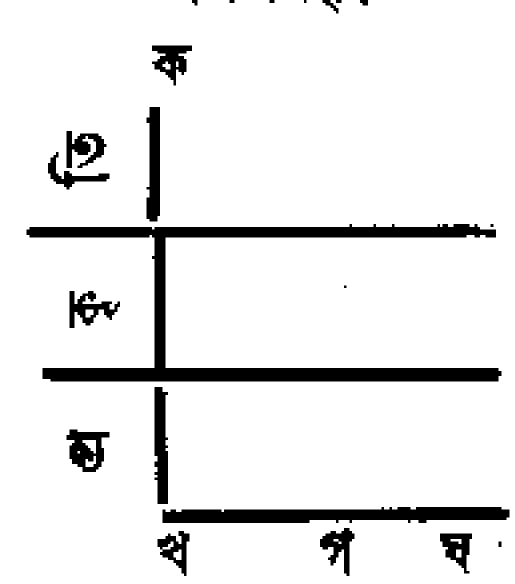

বিকৃতি

শুধু রমেশ দত্তের বেদ অথবা মক্ষমূলারের বেদ পড়িয়া নহে, কাশীতে গিয়া রীতিমত ব্রহ্মচর্য্য করিয়া বেদপারগ আচার্য্যের নিকট শিক্ষা কল্প প্রভৃতি অঙ্গের সহিত যে বেদ শব্দ আমরা শুনিয়া থাকি ও পড়িয়া থাকি, সে বেদশব্দও খাঁটী, অবিকৃত বেদশব্দ নহে, হইতে পারে না। বেদ শব্দের বিশুদ্ধ ও নিরতিশয় রূপ প্রজাপতির ধ্যানের মধ্যেই আবির্ভূত হইতে পারে; ঋষিদের দর্শনে শব্দের বা মন্ত্রের যে রূপ

ধরা পড়ে তাহাও প্রায় বিশুদ্ধ (approximate) ; তোমার আমার রসনায় ও কর্ণে তাহা অনেকটা বিকৃত। এ বিকৃতির হেতুগুলি পরে আলোচিত হইবে। এখন আমরা যে কথাটা বুঝিতে চাহিতেছি তাহা এই। গঙ্গা বিষ্ণুপাদোদ্ভবা, সুতরাং বৈকুণ্ঠধামে তাঁহার উৎপত্তি। বৈকুণ্ঠধাম গোলোকধাম, এবং গো শব্দের অর্থ বাক্ ইহা আপনারা স্মরণ রাখিবেন। স্বয়ং শিবজী কি যেন কি-একটা নেশা করিয়া গাহিতেছেন ও নাচিতেছেন ; আর "বাজাও ত গজবদন লম্বোদর মৃদঙ্গ নন্দভরে"। এই বিরাট্ নৃত্যে সর্ব্বভূতান্তরাত্মা যিনি বিষ্ণু তাঁহার সাত্ত্বিকভাব হইল, তিনি চঞ্চল হইলেন। এ চাঞ্চল্য কি সহজ চাঞ্চল্য ? সৃষ্টির গোড়ায় সর্ববব্যাপী চিৎশক্তিতে যে দুই হইবার, বহু হইবার জন্য চাঞ্চল্য দেখা দেয়, ইহা সেই চাঞ্চল্য। ইহাই গোলোকের পরাবাক্ বা পরশব্দ। পরশব্দের যে লক্ষণ আমরা দিয়া রাখিয়াছি তাহা আপনারা যেন মনে রাখিবেন। "তদ্বিষ্ণো পরমং পদম্"—সেই বিষ্ণুপদ যখন চঞ্চল হইল তখনই গঙ্গা আবির্ভূতা হইলেন। এ কোন গঙ্গা ? এ যে সনাতনী বেদময়ী শব্দময়ী গঙ্গা। ইহার তিন ধারা আমরা জানিতে পারিয়াছি—ঋক্, সাম, যজুঃ। সত্যসত্যই যে কত ধারা তাহা কে জানে ? বিষ্ণুপদে যখন গঙ্গার উদ্ভব হইল, তখন প্রজাপতি ব্রহ্মা তাঁহাকে কমণ্ডলুতে ধরিয়া লইলেন। এখানে পরাবাক্ অপরাবাক্ হইল, পরশব্দ শব্দতন্মাত্র হইল, শব্দের মূলীভূত চাঞ্চল্য, বিশুদ্ধ ও নিরতিশয় শব্দরূপে প্রকাশিত হইল। কোথায় ? প্রজাপতির ধ্যানে অথবা পারমার্থিক কর্ণে। ব্রহ্মাতে আসিয়া শব্দের প্রসূতি শব্দের প্রকৃতি হইল। নাস্তিক মহোদয় এ ব্যাখ্যায় রাগ করিবেন না। আমরা আপাততঃ যাঁহাকে প্রজাপতি বলিতেছি তিনি আমাদেরই অনুভব সামর্থ্যের পরাকাষ্ঠা মাত্র। জীবে অনুভব সামর্থ্যে নানান্ থাক্ রহিয়াছে (a variable magnitude, a series)। এই থাক্গুলির (seriesএর) পরাকাষ্ঠা (limit)

কোথায়—ইহারই অনুসন্ধান করিতে যাইয়া আমরা প্রজাপতিকে পাকড়াও করিয়াছি। গণিতশাস্ত্রে ও বিজ্ঞানে এরূপ পরাকাষ্ঠার অন্বেষণ হামেষা চলিতেছে ; তাহাতে কাহারও কিছুমাত্র আপত্তি দেখা যায় না। আমার প্রজাপতিকে নাস্তিক মহোদয় যদি কেবল একটা কল্পিত পরাকাষ্ঠা (conceptual limit) বলিয়াই মনে করেন, তাহা হইলেও আপাততঃ আমি উচ্চবাচ্য করিব না। উড্রফ সাহেব তাঁহার শব্দের ব্যাখ্যায় গণিত ও বিজ্ঞানশাস্ত্রের নজির লঙ্ঘন করিয়া রায় দেন নাই, এই কথাটি যদি এ পর্য্যন্ত খোলসা করিয়া বলিতে না পারিয়াছি তবে বঙ্কিমচন্দ্রের মত বৃথায়ই বকিয়া মরিয়াছি। আস্তিক ও নাস্তিক উভয়কেই আমরা পাত পাড়িয়া বসাইয়া দিয়াছি ; যিনি যে ভাবে লইবেন ; রসগোল্লা পাতে পড়িলে যিনি বিনা ওজরে মুখে তুলিয়া দিয়া রসাস্বাদন করিবেন তাঁহাকেও আমরা ডাকিয়া বসাইয়াছি ; আর যিনি পাতের রসগোল্লার দিকে চাহিয়া 'এটা সংজ্ঞা-মাত্র, কল্পনামাত্র, অথবা সত্যসত্যই একটা-কিছু' এইরূপ বিচার করিতে করিতে হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকিবেন, তিনিও আমাদের নিমন্ত্রণে বাদ যান নাই। সে যাহাই হউক, প্রজাপতির কমণ্ডলুতে যে গঙ্গা রহিলেন, তিনি ঠিক আমাদের মর্ত্ত্যের গঙ্গা নহেন। জ্ঞান-শক্তির পরাকাষ্ঠায় যে শব্দরাজি, যে বেদ রহিয়াছে, আমাদের কুণ্ঠিত, কৃপণ জ্ঞানে সে শব্দরাজির, সে বেদের, ঠিকভাবে ও পূরাপূরিভাবে থাকিবার সম্ভাবনা কোথায়? অতএব বেদেরও নানান্ থাক্— Veda-series। একটা যদি চরম থাক্ থাকে তবে তাহাই পূর্ণ ও বিশুদ্ধ বেদ (pure and perfect Veda)। যে গল্পটা পাড়িয়া-ছিলাম সেটা চলুক। ব্রহ্মার কমণ্ডলু হইতে হর-জটায় আসিয়া সুরশৈবলিনী পথ হারাইয়া, অপ্রকট হইয়া, কুলু-কুলু ধ্বনি করিতে লাগিলেন। ইহা হইল শব্দের এবং বেদের সূক্ষ্ম, অব্যক্ত অবস্থা— যে শব্দ যোগীরা দিব্য কর্ণে শুনিতে পান। মহাদেব যোগেশ্বর এ

কথাটাও আপনারা মনে রাখিবেন। শেষে গোমুখীতে পতিতপাবনী শৈলসুতাসপত্নী বসুধাশৃঙ্গারহারাবলীরূপে বসুন্ধরায় নামিয়া আসিলেন। ইহাই শব্দের ও বেদের স্থূল প্রকট মূর্ত্তি। গোমুখীর 'গো' মানে বাক্; গল্প এইখানে শেষ হইল; শব্দের পূর্ব্বব্যাখ্যাত সব কয়টা থাক্ আপনারা এই গল্পের মধ্যে পাইলেন ত? বিষ্ণুর চাঞ্চল্য পরশব্দ; ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে গঙ্গার আবির্ভাব শব্দতন্মাত্র বা শব্দের নিরতিশয় অবস্থা; হরজটাজালে গঙ্গার অবগুণ্ঠিতাবস্থা সূক্ষ্ম শব্দ; শেষে গোমুখী হইতে গঙ্গার পৃথিবীতে অবতরণ শব্দের স্থূল অবস্থা।

ব্রহ্মার ধ্যানে যে বেদশব্দ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল তাহার লক্ষণ কিসে? বিশুদ্ধ, নিরতিশয় শব্দকে চিনিয়া লইব কি লক্ষণ দ্বারা? পূর্ব্বেই বলিয়াছি—অর্থ ও প্রত্যয়ের সঙ্গে নিত্য, অব্যভিচারী সম্পর্ক থাকিলে, তবে বিশুদ্ধ শব্দ হয়। কাণ ধরিয়া টানিলে যেমন মাথাকে আসিতে হয়, সেইরূপ যে শব্দ উচ্চারিত হইলে তাহার বাচ্যবিষয় অথবা অর্থ তৎক্ষণাৎ নির্ম্মিত হইবে তাহাই শব্দতন্মাত্র, বিশুদ্ধ, নিরতিশয় শব্দ। বাইবেলে আছে—ঈশ্বর বলিলেন "আলোক হউক", আর অমনি আলোক হইল। বেদেও দেখিতে পাই প্রজাপতি "এতে" প্রভৃতি শব্দ করিলেন, আর এক এক জাতি সৃষ্টপদার্থ আবির্ভূত হইল। যে শব্দ হইলে তন্মূলীভূত বা তজ্জন্য স্পন্দক্রিয়া একটা বিশিষ্ট পদার্থ তৎক্ষণাৎ গড়িয়া ফেলিবে, তাহাই সমর্থ ও স্রষ্টা শব্দ; তাহাই নিরতিশয় শব্দ। ধর 'গৌঃ' এই জাতীয় শব্দ; যদি হয়, তবে যেই 'গৌঃ' শব্দ হইবে, অমনি তাহা সত্য সত্যই একটা গো সৃষ্টি করিয়া ফেলিবে। যদি তাহা পারে তবেই তাহা নিরতিশয় শব্দ, নতুবা নহে। নিরতিশয় শব্দ ও তাহার বিষয় বা অর্থের মধ্যে এমনই বাঁধন, যে শব্দ হইলে অর্থকে নির্ম্মিত হইতেই হইবে। বিশুদ্ধ শব্দ হইল, অথচ তাহার বিষয় বা অর্থ কোথায় তার ঠিকানা নাই, এমন

হয় না। বলা বাহুল্য, আমাদের শ্রুত বা উচ্চারিত কোন শব্দেই এ লক্ষণ খাটে না, সুতরাং কোনটাই বিশুদ্ধ শব্দ নহে। অবশ্য প্রত্যেক শব্দেরই অল্পবিস্তর ভাঙ্গিবার গড়িবার শক্তি আছে। প্রত্যেক শব্দই ছোট-খাট এক একজন ব্রহ্মা ও রুদ্র। কিন্তু তাই বলিয়া যেই আমি "টাকা" এই শব্দটা উচ্চারণ করিব, সেই সে শব্দস্পন্দগুলি অণু-পরমাণুগুলিকে সমন পাঠাইয়া ধরিয়া আনিবে এবং সাজাইয়া গুছাইয়া "রূপেয়া" গড়িয়া দিবে, টাকশাল ফাঁদিয়া বসিবে, এমন আশা কেহ করে না। আমার অভিপ্রেত পদার্থটি রচিয়া দিবার শক্তি আমাদের চলিত শব্দগুলির নাই। মুনি ঋষিদের উচ্চারিত শব্দের নাকি কতকটা এ সামর্থ্য—বস্তুকে গড়িয়া হাজির করিয়া দিবার শক্তি—ছিল। কপিঞ্জল শ্বেতকেতুর আশ্রমে যাইতে যাইতে শূন্যপথে কোনও বিমানচারী এক সিদ্ধকে তাড়াতাড়ি যেমন লাফাইয়া যাইলেন, অমনি সিদ্ধপুরুষ তাঁহাকে শাপ দিলেন—ঘোঁড়া হও; কপিঞ্জলকে ঘোঁড়া হইতেই হইল। এখানে শব্দশক্তি না অপর কিছু? দুর্ব্বাসা ঋষি আসিয়া কণ্বমুণির কুটীরদ্বারে দাঁড়াইয়া হাঁকিলেন—অয়মহং ভোঃ। শকুন্তলা বেচারী স্বামিচিন্তায় ডুবিয়াছিলেন, শুনিতে পাইলেন না। দুর্ব্বাসা রাগে গস্‌গস্ করিয়া "আঃ অতিথিপরিভাবিনি!" ইত্যাদি বলিয়া শাপ দিলেন। শাপ ফলিল। কিসের জোরে? এ সব দৃষ্টান্তে যাহাই হউক, আমাদের শব্দগুলি সাধারণতঃ এমনই ফাঁকা আওয়াজ যে বাক্‌সর্ব্বস্ব কথাটা আমাদের কাছে গাল'ই হইয়া আছে। শব্দ হইলেই অর্থ যদি আপনা হইতেই যুটিত, তবে বাঙ্গালীর মত সার্থক হইত আর কে?

যাহাই হউক, অর্থকে গড়িয়া তুলিবার সামর্থ্য-বিশিষ্ট যে শব্দ তাহাই নিরতিশয় শব্দ। এখানেও সেই পরাকাষ্ঠার (limitএর) কথা। সকল শব্দই কিছু না-কিছু নাড়াচাড়া দিয়া ভাঙ্গিবার গড়িবার চেষ্টা করে। তারা বাতাসের ঢেউ, করিবারই কথা।

কোনও শব্দ বেশী, কোনও শব্দ কম। সাধারণতঃ ছন্দোবদ্ধ শব্দগুলি গড়ার দিকে কতক কৃতিত্ব দেখায়। তাই বলিয়া যেই আমি জলদগম্ভীর স্বরে গাহিব "বৃষ্টি পড়িছে টুপ্‌টাপ্‌" সেই পর্জ্জন্যদেব সত্যসত্যই এক পশ্‌লা বর্ষিয়া যাইবেন, এমন মেঘমল্লার আমি সাধিয়া উঠিতে পারি নাই। তবে তানসেন দীপকরাগে পুড়িয়া মরিয়াছিলেন, একথাও স্মরণ রাখিবেন। অর্থাৎ আমার যে ছন্দোবদ্ধ শব্দটি অনেক পরিমাণে ব্যর্থ, গুণিব্যক্তির সাধাগলায় বাহির হইলে তাহাই আবার সার্থক। কাজেই প্রশ্ন উঠিতেছে—শব্দের কিছু-একটা গড়িয়া তুলিবার সামর্থ্য কতদূর পর্য্যন্ত। এখানেও নাস্তিক মহাশয়কে আমি মাথা নাড়িতে দিব না। যদি শব্দের সৃষ্টি-সামর্থ্যের (dynamic or creative function এর) একটা পরাকাষ্ঠা থাকে তবে তাহাই নিরতিশয় শব্দ। ইহাকেই সার জন্ উড্‌রফ স্বাভাবিক শব্দ (natural name) বলিতেছেন। তাঁহার নিজের ভাষায় স্বাভাবিক শব্দের লক্ষণ (test) এইরূপ :—the sound being given, a thing is evolved : conversely, a thing being given, a sound is evolved. যদি শব্দটা থাকে তবে তার অভিধেয় বস্তুটা গড়িয়া উঠিবে ; যদি বস্তুটা থাকে তবে তার শব্দ (অবশ্য শুনিবার কাণ থাকিলে) অভিব্যক্ত হইবেই। অর্থাৎ, শব্দ ও অর্থ যেন আমার হাতের দুইটা পিঠের মতন এদিক্ ওদিক্।)

মাথার উপরে পাখা ঘুরিতেছে, তার শব্দ আমি শুনিতেছি ; কিন্তু আমার চশমার উপর একটি জলবিন্দু বা ধূলিকণা রহিয়াছে তাহার শব্দ কি আমি শুনিতে পাই ? তাহার আবার শব্দ ! আছে বৈকি ! আমার ভৌতিক কর্ণের কাছে নাই ; যোগীর দিব্যকর্ণের কাছে হয় ত থাকিতে পারে ; পারমার্থিক কর্ণের কাছে নিশ্চয়ই আছে। কি ভাবে ? মনে রাখিবেন, চাঞ্চল্য থাকিলেই যে কর্ণ নিরতিশয়রূপে শুনিতে পায়, তাহাই পারমার্থিক কর্ণ। ইলেক্‌ট্রনের চলাফেরাই

হউক, ঈথার তরঙ্গগুলির অভিযানই হউক, অণুপরমাণুগুলির কম্পনই হউক, অথবা এ সকল অপেক্ষা স্থূল কোন রকম চাঞ্চল্যই হউক— পারমার্থিক শ্রবণসামর্থ্যে সবই শ্রুত হইবে। দিব্যকর্ণেও ইহাদের অনেকগুলি শ্রুত হইতে পারে। এখন দেখা যাক্, চশমার উপর এই জলকণাটি কি? বহুসংখ্যক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জলের দানা পরস্পরকে ধরিয়া বাঁধিয়া এই জলকণাটি গড়িয়া রাখিয়াছে। প্রত্যেক দানা (molecule)র মধ্যে আবার অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের পরমাণুগুলি রহিয়াছে; তাহাদের ভিতরে ইলেক্‌ট্রনগুলি আবার সৌরজগতে গ্রহ-উপগ্রহের মত পাক দিতেছে। দানাগুলি কাঁপিতেছে; পরমাণুগুলি নিজেদের একটা ব্যূহরচনা করিয়া (রসায়নশাস্ত্র ইহা Space-representation দিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করে) স্পন্দিত হইতেছে; আর ইলেক্‌ট্রনগুলার ত কথাই নাই। অতএব জলকণাটি চাঞ্চল্য-বিশিষ্ট; বিশেষভাবে তলাইয়া দেখিলে ইহা চিদ্‌বস্তুর ভিতরে একটা চাঞ্চল্যবিশেষ ছাড়া আর কিছুই নহে। সুস্থির জলে একটা ঢেলা ফেলিলাম; একটি কেন্দ্র করিয়া লইয়া উত্তেজনার সৃষ্টি হইল। অপর জায়গায় আর একটা ঢেলা ফেলিলে অপর একটা উত্তেজনার কেন্দ্র আমরা পাই। এইরূপ বহু উত্তেজনা-কেন্দ্র (centres of disturbance) আমরা পাইতে পারি। জগতে যে সকল বস্তুকে আমরা এক-একটা দ্রব্য বলিতেছি তাহারা (এবং আমরা নিজেরাও) ঐরূপ এক একটা উত্তেজনার কেন্দ্র। আধার বা উপাদানটা কি তাহা আপাততঃ ভাবিয়া দেখার দরকার নাই; শাস্ত্র সেটাকে চিদ্‌বস্তু বা চিৎসত্তা বলিয়াছেন। কতকগুলি শক্তি (forces) দ্বারা এক একটা উত্তেজনা-কেন্দ্রের সৃষ্টি হয় ও স্থিতি হয়। জলে একটা আবর্ত্ত উৎপাদন করিতে এবং তাহাকে কিছুক্ষণ বাহাল রাখিতে কতকগুলি শক্তির সমাবেশ আবশ্যক। সেই শক্তিগুলিই আবর্ত্তের সৃষ্টি ও স্থিতির মালিক। সাহেব সেগুলিকে constituting forces

বলিয়াছেন। তুমি আমাকে টানিতেছ, আমি তোমাকে টানিতেছি; তুমি একটা শক্তি প্রয়োগ করিতেছ, আমি আর একটা। কিন্তু এই টানাটানি ব্যাপারকে যদি সমগ্র, সমস্ত করিয়া দেখা যায় তবে তাহার ইংরাজি পরিভাষা হইবে stress (শক্তিগুচ্ছ বা শক্তিব্যূহ); বর্ত্তমান দৃষ্টান্তে শক্তিব্যূহের দুইটা অংশ (elements or partials) —তোমার টানা ও আমার টানা। অতএব শক্তিব্যূহ শব্দটা ব্যবহার করিয়া আমরা বলিতে পারি যে জলের আবর্ত্তটির মূলে শক্তিব্যূহ (causal stress) রহিয়াছে; তোমার মূলেও একটা শক্তিব্যূহ, আমার মূলেও একটা, সকল জিনিসের মূলেই এক-একটা শক্তিব্যূহ রহিয়াছে। আমরা নিজের প্রয়োজনমত ব্রহ্মাণ্ডটাকে টুক্‌রা টুক্‌রা দেখিতেছি; এবং ভাবিতেছি বুঝি একটা টুক্‌রার সঙ্গে আর একটা টুক্‌রার সম্পর্ক নাই, শক্তিব্যূহগুলি সব দুর্ভেদ্য ও পরস্পরের সম্বন্ধে নিরপেক্ষ, উদাসীন। প্রকৃত ব্যাপার কিন্তু সেরূপ নহে। এই ব্রহ্মাণ্ড একটা বিরাট্ অবিচ্ছিন্ন শক্তিব্যূহ (an infinite system of stresses); যাহাকে জলের আবর্ত্ত বা ঈথারের আবর্ত্ত বলিতেছি সেটা সেই বিরাট্ ব্যূহের একটা অঙ্গ বা অবয়ব (partial) মাত্র। এখন, জলকণার কারণীভূত শক্তিব্যূহ যে চাঞ্চল্য জাগাইয়া রাখিয়াছে —ইলেক্‌ট্রনদেরই বল আর স্থূলতর দানাগুলারই বল—সেই চাঞ্চল্য পারমার্থিক কর্ণে (absolute earএ) শ্রুত হইলে যে শব্দাভিব্যক্তি হয়, সেই শব্দই জলকণার খাঁটী স্বাভাবিক শব্দ। জলকণার বেলায় যেরূপ, এই খড়ির টুক্‌রা বা অপর যে-কোনও দ্রব্য ("চেতন, অচেতন, উদ্ভিদ্") এর বেলাতেও সেইরূপ। প্রত্যেকের সৃষ্টি ও স্থিতির মূলে শক্তিব্যূহ (constituting forces or causal stress) রহিয়াছে; নিরতিশয় শ্রবণসামর্থ্যে সেই শক্তিব্যূহের যে শব্দরূপে অভিব্যক্তি, তাহাই পদার্থের বিশুদ্ধ স্বাভাবিক শব্দ। জীবকোষের চলা-ফেরা হইতেছে; হ্রাসবৃদ্ধি হইতেছে; তাহার ভিতর ভাঙ্গা-চোরা

(anabolism, katabolism) চলিতেছে ; এই সর্ব্ববিধ চাঞ্চল্যের মূলে যে শক্তিব্যূহ, তাহাই শব্দজ্ঞান জন্মাইলে, আমরা জীবকোষের স্বাভাবিক শব্দ পাই। আমি অবশ্য এ শব্দ ভৌতিক কর্ণে শুনিতে পাই না ; ইলেক্‌ট্রনের চলা-ফেরা, ঈথারের আবর্ত্ত শুনিব কি প্রকারে ? বৈজ্ঞানিক ও যোগী দিব্যকর্ণে অতীন্দ্রিয় শব্দগুলির কতক কতক হয় ত শুনিতে পান ; আমরা পারমর্থিক কর্ণের যে সংজ্ঞা দিয়াছি, তাহাতে, যেখানেই শক্তিব্যূহ কোনও প্রকার চাঞ্চল্য জাগাইয়া রাখিবে, সেখানেই সে চাঞ্চল্য পারমার্থিক কর্ণে শব্দরূপে শ্রুত হইবে ; এবং তাহাই সে ক্ষেত্রে স্বাভাবিক শব্দ। যে জিনিষের যাহা স্বাভাবিক শব্দ, তাহাই তাহার নাম দিলে আমরা স্বাভাবিক নাম (Natural Name) পাই।

স্বাভাবিক শব্দ বস্তুর বীজমন্ত্র। যথা, 'রং' অগ্নির বীজমন্ত্র। যে জিনিষটাকে আমরা অগ্নি বলিতেছি, তাহার মূলে অবশ্য শক্তি-ব্যূহ (constituting forces) রহিয়াছে ; সেই শক্তিব্যূহ আমাদের চক্ষুকে উত্তেজিত করিয়া অগ্নির রূপজ্ঞান জন্মায় ; ত্বগিন্দ্রিয়ের স্নায়ু-গুলিকে উত্তেজিত করিয়া তাপজ্ঞান জন্মায় ; কিন্তু সাধারণতঃ আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়কে উত্তেজিত করিয়া কোনও শব্দজ্ঞান জন্মায় না। পার-মার্থিক কর্ণে কিন্তু তাহার একটা শব্দ আছে ; দিব্যকর্ণও সে শব্দ কতকটা ধরিয়া ফেলিতে পারেন। দিব্যকর্ণ সেই শব্দকে 'রং' বলিয়া শুনিয়াছেন ; এটি পরীক্ষণীয় ব্যাপার—রসায়নশাস্ত্রের অনেক ব্যাপার যেরূপ ; আমরা যতক্ষণ পরীক্ষা করিয়া মিলাইয়া না লইতেছি, ততক্ষণ গুরুমুখে ও শাস্ত্রমুখে কেবল আমাদের শুনিয়াই রাখিতে হইতেছে যে লং বং রং যং হং এইগুলি ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুদ্‌ব্যোমের স্বাভাবিক নাম এবং বীজমন্ত্র। পারমার্থিক কর্ণের সংজ্ঞা আমরা করিয়া লইয়াছি, কিন্তু সে কর্ণ স্পর্শ করার অধিকার আমাদের নাই ; আমরা খুব জোর দিব্যকর্ণ লইয়া নাড়াচাড়া করিতে পারি। এই

দিব্যকর্ণের নজিরে আমরা বলিতেছি যে, অগ্নি বা ব্যোমের মূলে যে শক্তিব্যূহ রহিয়াছে, তাহার যে শব্দরূপে অভিব্যক্তি (acoustic equivalents) তাহাই অগ্নির বা ব্যোমের বীজমন্ত্র—রং বা হং। অবশ্য দিব্যকর্ণের শোনা শব্দ প্রায় বিশুদ্ধ, নিরতিশয় নহে; এইজন্য সাহেবের ভাষায় রং বা হং হইতেছে *approximate* acoustic equivalents of the underlying stresses or constituting forces of fire and æther. শুধু পঞ্চভূতের কেন, যত্র জীব তত্র শিব, যত্র শিব তত্র শক্তি; কাজেই জীবমাত্রেরই একটা নিজস্ব বীজ-মন্ত্র আছে। আমি দীক্ষার সময় গুরুমুখে যে মন্ত্র পাই, সেটা আমার নিজস্ব বীজমন্ত্রের অনুরূপ অথবা অনুকূল হওয়া চাই; বিরোধ হইলে, আমার ভিতরকার শক্তিব্যূহ (causal stress) অস্বস্থ, এমন কি ব্যাহত হইয়া পড়িবে। গানে গলার সুর ও যন্ত্রের সুরের গরমিল (dis-harmony, discord) হইলে যাহা হয়, কতকটা তাহাই। বীজমন্ত্রের বা স্বাভাবিক নামের আর বেশী দৃষ্টান্ত লইয়া আলোচনা করার সময় আজ আমাদের নাই। বীজমন্ত্র মৌলিক (simple) ও যৌগিক (compound) হইতে পারে।• "রং" মৌলিক বীজ, "হংসঃ", "হ্রীং" ক্রীং" প্রভৃতি যৌগিক। আর এক কথা। স্বাভাবিক শব্দ বা বীজমন্ত্রকে আমরা যেন গুলাইয়া না ফেলি। শঙ্খ বাজাইলাম, অথবা কাক ডাকিল; এখানে শঙ্খের শব্দ বা কাকের ডাককে আমরা সাধারণতঃ স্বাভাবিক শব্দ বলি। আমাদের লক্ষণ অনুসারে ঠিক স্বাভাবিক নহে। যে শক্তিব্যূহ শঙ্খকে শঙ্খ করিয়া রাখিয়াছে, তাহারই যে শব্দরূপে অভিব্যক্তি (পারমার্থিক কর্ণেই হউক আর দিব্যকর্ণেই হউক), সেইটাই শঙ্খের স্বাভাবিক নাম বা বীজমন্ত্র হইবে। অবশ্য শঙ্খধ্বনিটা শঙ্খের বীজশক্তির সঙ্গে সম্বদ্ধ বই সম্বন্ধ-শূন্য নহে। কাকের ডাক শুনিয়া আমরা কাকের নাম দিয়াছি কাক; এ নাম কাকের বীজমন্ত্র নহে; তবে কাকের ডাকটা কাকের কাকত্ব

হইতেই নিঃসৃত হইতেছে; এইজন্য কাকের বীজমন্ত্রের নাম যদি মুখ্য (primary) স্বাভাবিক নাম হয়, তবে তার ডাক শুনিয়া তাহাকে যে নাম আমরা দিয়াছি, সে নামকে আমরা বলিব, গৌণ (secondary) স্বাভাবিক নাম।

স্বাভাবিক নাম বা বীজমন্ত্রের মোটামুটি বিবরণ আপনারা পাইলেন। সাহেব স্বাভাবিক নামের যে শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন সেটা বিশেষভাবে দেখার বিষয়। সে শ্রেণীবিভাগ (classification) প্রবন্ধান্তরে বিশেষভাবে আলোচিত হইলেই ভাল হয়। আজ আপনাদের কৌতূহল নিবৃত্ত করার জন্য নয়, জাগাইয়া দিবার জন্যই সেই শ্রেণীবিভাগের উল্লেখমাত্র করিলাম। বীজমন্ত্রের গোড়ার কথা গুলি (principles) আমরা এই প্রবন্ধে কতকটা নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিলাম; শ্রেণীবিভাগটি বুঝিলে গোড়ার কথা কয়টি বুঝিবার আরও সুবিধা আমাদের হইতে পারে। আপাততঃ, স্বাভাবিক নাম বা বীজমন্ত্রের দুইটা দিকই আপনারা যেন স্মরণ রাখিবেন। কোন দ্রব্য মানে, একটা শক্তিব্যূহ ও চাঞ্চল্যের কেন্দ্র; এইটি থাকিলেই তার একটা শাব্দিক প্রতিকৃতি (acoustic equivalent) থাকিবে —পারমার্থিক কর্ণেই হউক আর দিব্যকর্ণেই হউক; ইহাই তাহার বীজমন্ত্র। এই একটা দিক্। পক্ষান্তরে, বীজমন্ত্র বা স্বাভাবিক শব্দ থাকিলেই, দ্রব্য সঞ্জাত বা আবির্ভূত হইবেই; যোগীরা 'রং' উচ্চারণ করিলে অগ্নির আবির্ভাবের সম্ভাবনা আছে। তুমি আমি 'রং' অথবা 'অগ্নিমীলে' প্রভৃতি যৌগিকমন্ত্র পুনঃপুনঃ রীতিমত ছন্দে উচ্চারণ করিলে শক্তির সংহতি (summation of stimuli, superposition of motions) হইয়া অগ্নি জ্বলিয়া উঠিতে পারে, অন্ততঃ জঠরানল ত বটেই। ইলেক্ট্রনগুলি পুনঃপুনঃ ধাক্কা দিয়া মাথার উপর ঐ তারের মধ্যে যেমন বিজ্‌লি বাতি জ্বালাইয়া দিতে পারে, এখানেও সেইরূপ। আমার উচ্চারিত মন্ত্র বিশুদ্ধরূপে স্বাভাবিক নহে, কাজেই তাহাকে ফল

দেখাইতে হইলে, ধ্বনি ছন্দ প্রভৃতি বাহাল রাখিয়া বার বার আমায় সেটী জপ পুরশ্চারণ করিতে হয়।

শেষ কথা, মন্ত্রের কথা পরীক্ষা করিয়া দেখার কথা, বিজ্ঞানের কথার মত। হয়ত পরীক্ষায় সেগুলি 'হিং টিং ছট্' রূপেই ধরা পড়িতে পারে; আপাততঃ আমরা জানিনা। তবে এটা বিলক্ষণই জানি যে ভারতের পঁচিশ কোটি হিন্দুর (শুধু হিন্দুর কথাই বলিতেছি) জীবনে মরণে, বিবাহে শ্রাদ্ধে, ক্রিয়াকর্ম্মে ও নিত্য নৈমিত্তিক সকল অনুষ্ঠানে যে মন্ত্র এখনও এতটা আধিপত্য করিতেছে, সেটা আমরা দু'পাঁচজন বাচাল কূপমণ্ডূক বাজে আলোচনা বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলেও, সেটার চেয়ে বেশী কেজো কথা আমিতো কমই দেখিতে পাই।

স্বাভাবিক শব্দ বা মন্ত্র

(শেষাংশ)

গতবারে আমরা শব্দের গোড়ার কথা কতকপরিমাণে আলোচনা করিয়াছি। শব্দের দিক্ হইতে দেখিতে যাইয়া আমরা আমাদের জগৎ প্রত্যয়ের (experience of the worldএর) পাঁচটা থাক্ আবিষ্কার করিতে পারিয়াছি—অশব্দ, পরশব্দ, শব্দতন্মাত্র, সূক্ষ্ম শব্দ এবং স্থূল শব্দ। শেষ তিনটাকে আমরা জড়াইয়া অপরশব্দ সংজ্ঞা দিয়াছিলাম। সম্মুখে বিশাল জলরাশি। জলে যদি চাঞ্চল্যের লেশ না থাকে, জলরাশি যদি একখানা স্ফটিক দর্পণের মত সম্মুখে পড়িয়া থাকে, তবে তাহার অবস্থা অশব্দের অবস্থা। জলে চাঞ্চল্য জাগিয়াছে, তরঙ্গগুলি ছুটাছুটি করিতেছে, ভাঙ্গিতেছে উঠিতেছে; ইহাই হইল পরশব্দের অবস্থা। আমি বা অপর কেহ সে উর্ম্মিচাঞ্চল্য শুনিবার জন্য উপস্থিত না থাকিলেও তাহা পরশব্দ। কারণ, আমরা স্পন্দ বা চাঞ্চল্য মাত্রকেই পরশব্দ বলিব, এইরূপ পরামর্শ করিয়া লইয়াছি। সে চাঞ্চল্য শ্রবণযোগ্য ও শ্রুত হউক আর নাই হউক। তারপর, স্বয়ং প্রজাপতি মহাশয় তাঁহার কর্ণে, অর্থাৎ নিরতিশয় শ্রবণসামর্থ্য দ্বারা, জলরাশির সেই চাঞ্চল্য শুনিলেন; অবশ্য এমনভাবে শুনিলেন যার চেয়ে বেশী ও খাঁটিভাবে শোনা আর হইতে পারে না। ইহাই হইল শব্দতন্মাত্র—বর্ত্তমান ক্ষেত্রে, তরঙ্গচাঞ্চল্যের বিশুদ্ধ, অবিকৃত বাণীমূর্ত্তি। ইহাই শব্দের প্রকৃতি ও আদর্শ (standard)। ঢেউগুলি যতই ছোট হউক না কেন, চাঞ্চল্য যতই মৃদু হউক না কেন, এমন কি বাহিরে স্পষ্টতঃ কোনওরূপ চাঞ্চল্য না থাকিয়া যদি শুধু অণু-পরমাণু ইলেকট্রন্‌গুলারই চাঞ্চল্য থাকে, তবুও তাহা

প্রজাপতির কর্ণের নিকট পাশাইয়া যাইবে না; কারণ, আমাদের সংজ্ঞা-মত সে কর্ণ যে শ্রবণশক্তির পরাকাষ্ঠা, নিরতিশয় শ্রবণ-সামর্থ্য। যিনি কল্পিত পরাকাষ্ঠা বলিতে চাহেন তিনি তাহাই বলিয়া তৃপ্ত হউন। পক্ষান্তরে, চাঞ্চল্য যতই বিরাট্, বিপুল হউক না কেন তাহাও প্রজাপতি শব্দরূপে শুনিতেছেন। কোনও স্পন্দ তোমার আমার শ্রবণযোগ্য হইতে হইলে একটা অধঃরেখা এবং একটা উর্দ্ধরেখার মাঝের কোনও অবস্থায় তাহাকে থাকিতে হইবে। সূক্ষ্মতার একটা সীমা অতিক্রম করিয়া যাইলে সেটা আর আমাদের শ্রবণযোগ্য হইবে না; আবার বিপুলতার একটা সীমা লঙ্ঘন করিলেও সে আমাদের কাণে শব্দরূপে ধরা পড়িবে না। প্রজাপতির বেলায় এইরূপ কোন সীমারেখা নাই। এ প্রকার শ্রবণসামর্থ্যের কথা আমরা পূর্ব্বপ্রবন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছি। যেখানে ধাপের উপর ধাপ, থাকের উপর থাক্ দেখিতে পাই, সেখানেই একটা পরাকাষ্ঠার কথা, চরমের কথা আমরা ভাবিয়া লইতে পারি; সেই পরাকাষ্ঠার ভূমিই প্রাজাপত্য-পদবী—ঐশ্বর্য্য; যোগ-শাস্ত্র যাহার লক্ষণ দিতে গিয়া বলিয়াছেন—"তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞত্ব-বীজম্।"

সে যাহাই হউক, এখন অগস্ত্য যদি এক গণ্ডূষে সমুদ্র পান করিবার সঙ্কল্প করিয়া আমাদের সিন্ধুতটে গিয়া উপস্থিত হন, তবে তিনি তাঁহার দিব্যকর্ণে হয়ত সাগরের এত মৃদু স্পন্দগুলির ভাষা শুনিবেন, যেগুলি তোমার আমার ভৌতিক কর্ণে আদৌ কোন সাড়া দেয় না। আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগেও বৈজ্ঞানিক যোগীরা তাঁহাদের যন্ত্ররূপ দিব্যকর্ণের সাহায্যে যে সমস্ত সূক্ষ্ম, ব্যবহিত, বিপ্রকৃষ্ট জিনিষের স্পন্দগুলিকে ধ্বনিরূপে ধরিয়া ফেলিতেছেন, সেগুলির ভাষা যে অমনভাবে কোন কালে আমরা শুনিতে পাইব, তাহা পূর্ব্বে কল্পনায় আনিতেও সাহস করিতাম না। এখন বিজ্ঞানের কল্যাণে

যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণা ফেলিয়া দিলেই টেলিফোঁ নামক যন্ত্রের নলটি কাণের সন্নিকটে আনিয়া তাহাকে দিব্যকর্ণ বানাইয়া লইতে পারিব, এবং সেই দিব্যকর্ণের মাহাত্ম্যে, তুমি কাশীতে বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিলে, আমি এই তত্ত্ববিদ্যাসমিতির গৃহে বসিয়া ধ্যানস্থ (clairvoyant) না হইয়াই তাহা অবিকল শুনিতে পাইব। তত্ত্ববিদ্যার অনুশীলকেরা ধ্যানধারণাপ্রসাদাৎ সে কাজ বে-খরচায় হাঁসিল করিয়া ফেলিতে পারেন; সুতরাং তাঁহাদের আর এখানে খরচা করিয়া টেলিফোঁর বন্দোবস্ত করিতে হয় নাই। তবে আবার, বিজ্ঞানও বোধ হয় তত্ত্ববিদ্যার ইঙ্গিত অনুসরণ করিয়াই চলিতেছে। টেলিফোঁএ তোমার ও আমার মধ্যে তার টাঙ্গাইয়া লইতে হয়। তাহাতে হাঙ্গামা অনেক, খরচ বিস্তর। আমাকে যে পরিমাণে জড়ের সহায়তা লইয়া অভিলাষ পূরণ করিতে হইবে, সেই পরিমাণে জড়ের কাছে দাসখৎ লিখিয়া দিয়া তার গোলামি করিতে হইবে। ইচ্ছা করিলাম আর কাজ হইল—এমনটা হইবে না; কাজ করিতে গেলে বাহিরের যে পাঁচটা জিনিষের উপর আমাকে নির্ভর করিতে হয়, তাহাদের রীতি-মত ভাবে যোগাযোগ করিয়া লইতে হইবে। এই জন্য বৈজ্ঞানিকের টেলিফোঁ আমার অনেক সুবিধা করিয়া দিলেও আমায় স্বাধীন করিয়া দিতে পারে নাই। শুধু টেলিফোঁ কেন, বৈজ্ঞানিকের অনেক আয়োজনই আমাকে গোলাম করিয়া রাখিতেছে—বাহিরটার কাছে, পরের কাছে। দেওয়ালে ঐ বোতামটা টিপিলাম আর মাথার উপর সুরঞ্জিত কাচপুরীর ভিতর কেমন নিমেষে বিজলি বাতি জ্বলিয়া উঠিল। বেশ মজা। কিন্তু যে বিরাট তারের ব্যূহ আমাদের সহরটার মাথার উপর আকাশকে ছাইয়া রাখিয়াছে, অথবা আমাদের পদনিম্নে সর্ব্বংসহা ধরিত্রীর কলেবরে শিরা প্রশিরার মত নিজেকে চালাইয়া দিয়াছে। সেই তারের স্থল-বিশেষে যদি একটু গোলযোগ বাধিয়া যায়, তবে আমি দেওয়ালে বোতাম টেপা কেন, মাথামুড় খুঁড়িয়া আমার নিমতলা

প্রাপ্তির সম্ভাবনা করিয়া তুলিলেও, আমার ঘরের ভিতর অন্ধকারের জমাট্ একটুখানিও ভাঙ্গিবে না। আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞানের মায়াপুরী আমাদের চিনাইয়া দিয়া গিয়াছেন ; কিন্তু সেটা যে আবার গোলামখানাও, এ-কথাটাও আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে। বিজ্ঞানও মর্ম্মে-মর্ম্মে সেটা বিলক্ষণ অনুভব করেন। তাই টেলিফোঁ টেলিগ্রাফের খুঁটিগুলি উপ্‌ড়াইয়া ফেলিয়া, বিজ্ঞান, সূক্ষ্ম ও দূরবর্ত্তী স্পন্দ-গুলিকে ধরিবার আর এক রকম ফন্দি সম্প্রতি আবিষ্কার করিয়াছেন। এ ক্ষেত্রে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি আচার্য্য মাক্সওয়েল ও হার্জ। মর্কোণি-নামা পুরোহিতের কর্ম্মকুশলতায় সে মন্ত্রের যথাযথ বিনিয়োগ হইয়াছে, এবং তাহার ফলে আমরা পাইয়াছি তারহীন বার্ত্তাবহ। সমুদ্রের গভীর জলে তার (cable) ফেলিয়া রাখিবার আর তেমন দরকার নাই ; লম্বা লম্বা খুঁটি পুঁতিয়া শত শত যোজন তার টাঙ্গাইয়া আর না রাখিলেও খপরের বিনিময় চলিতে পারে। এ দৃষ্টান্তে তারের গোলামি আমাদের কমিল বটে, কিন্তু বাহিরে যে যন্ত্র আমাদের তৈয়ার করিয়া রাখিতে হইতেছে, সময়ে-সময়ে সেটা এমন বিশাল মূর্ত্তিতে দেখা দেয় যে তাহার সম্মুখে আমাদের মত আদার ব্যাপারীর প্রাণ বিস্ময়ে ও ভয়ে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়ে। তারহীন বার্ত্তাবহে আমাদের শক্তির বিস্তার বাড়িয়াছে এবং বাহিরের গোলামী অপেক্ষাকৃত কমিয়াছে বটে, কিন্তু শক্তির পরাকাষ্ঠায় আমরা অবশ্য পৌঁছাই নাই, এবং আমাদের গোলামিও একেবারে অপগত হয় নাই। শক্তির পরাকাষ্ঠা যেখানে তাহাই প্রাজাপত্যপদবী ; যে ভূমিতে উঠিলে সমস্তই আত্মবশ তাহাই স্বারাজ্যসিদ্ধি। ইহাই লক্ষ্য। বিজ্ঞানও নানা ভুল-ভ্রান্তি, সংশয়-সংস্কারের মধ্য দিয়া এই লক্ষ্যের অভিমুখেই চলিয়াছে। তত্ত্ববিদ্যা ও ভারতবর্ষের অধ্যাত্মশাস্ত্র যদি ঠিক হয়, তবে তাহার অনুশীলনের ফলে মানুষ ঐ লক্ষ্যের দিকে আরও কাছাইয়া আসিতে পারে। যে ঈথারতরঙ্গগুলি তারহীন

বার্ত্তাবহ যন্ত্র (co-herer) পাতিয়া ধরিতেছে, সেগুলি এবং তার চেয়েও সূক্ষ্ম কম্পনগুলি যদি আমরা শুধু ধ্যানেই ধরিয়া ফেলিতে পারি, তবে শক্তির পরাকাষ্ঠার দিকে বেশী অগ্রসর ত হইলামই, অধিকন্তু সে শক্তি, বাহিরের সম্বন্ধে অনেক বেশী নিরপেক্ষ ও স্বাধীন হইল ; দূরের সূক্ষ্ম স্পন্দনগুলি গ্রহণ করিতে, বাহিরে একটা যন্ত্র বানাইয়া পাতিয়া রাখিতে আর হইল না। এ দৃষ্টান্তে সেই পূর্ব্বের কথাটাই পরিষ্কার হইতেছে—দিব্যকর্ণের বা যোগজ শব্দপ্রত্যক্ষের নানা থাক্ রহিয়াছে ; যেমন যন্ত্র তেমন শোনা ; আবার ধ্যান-ধারণা যত গাঢ়, অনুভবও তত গভীর। এই দিব্যকর্ণের চরম পরিণতি পারমার্থিক কর্ণে ; সকল যোগজ বিভূতির পূর্ণবিকাশ স্বয়ং যোগেশ্বরে। বলা বাহুল্য, তোমার আমার স্থূল কর্ণেরও শব্দ গ্রহণ সামর্থ্যের তার-তম্য রহিয়াছে। বিভিন্ন জাতির জীবের ত কথাই নাই।

জলরাশির দৃষ্টান্ত লইয়া আমরা এ পর্য্যন্ত পূর্ব্বপ্রবন্ধে ব্যাখ্যাত প্রধান কথা কয়টাই আবার ঝালাইয়া লইলাম। শব্দের পাঁচটা থাক্ এবং শব্দ গ্রহণ সামর্থ্যের তিনটা থাক্, ইহাই একটা প্রধান কথা। আর একটা প্রধান কথা, স্বাভাবিক শব্দ বা বীজমন্ত্রের লক্ষণ। দ্রব্য একটা শক্তিব্যূহ। সেই শক্তিব্যূহ যে চাঞ্চল্য জাগাইয়া রাখিয়াছে, তাহা যদি কোনও নিরতিশয় শ্রবণ-সামর্থ্য দ্বারা শব্দরূপে গৃহীত হয়, তবে সেই শব্দই সে দ্রব্যের স্বাভাবিক নাম বা বীজমন্ত্র। এরূপ বিশুদ্ধ বীজমন্ত্রের নিজের দ্রব্য বা অর্থ গড়িয়া তুলিবার শক্তি আছে। আমরা গুরুমুখে বা সাধনায় যে বীজমন্ত্রগুলি পাই, সেগুলি অল্পবিস্তর পরিমাণে বিকৃত ও সঙ্কীর্ণ। এইরূপ হইবার যে কারণ আছে, তাহা আমরা সংক্ষেপতঃ পূর্ব্বপ্রবন্ধে নির্দ্দেশ করিয়াছি। আমাদের চলিত বীজমন্ত্রগুলি বিশুদ্ধ নহে বলিয়া তাহাদের স্বাভাবিক শক্তি (অর্থ গড়িয়া লইবার শক্তি) একপ্রকার সুপ্ত বলিলেই হয়। মন্ত্রোদ্ধার ও মন্ত্রচৈতন্য এবং জপ পুরশ্চারণ

প্রভৃতির দ্বারা সে শক্তি ধীরে-ধীরে জাগাইয়া লইতে হয়। দৃষ্টান্ত ও যুক্তি দেখাইয়া এই কয়টা কথা প্রতিপন্ন করিতে আমরা পূর্ব্ব-প্রবন্ধে প্রয়াস পাইয়াছি।

জড়জগতের সবিতা গ্রহ-উপগ্রহগুলির আদিম অবস্থা রূপে একটা বিপুল নীহার-সমুদ্র কল্পনা করিতে বৈজ্ঞানিকেরা এখনও ভালবাসেন। ঋষিরাও জগতের (শুধু জড়জগতের নয়) আদি কারণ বা উপাদানকে কারণসলিলরূপে ভাবিয়া গিয়াছেন। ঋষিরা আর-যাহা হউন আর না-ই হউন, কবি। তাঁহাদের বেদপুরাণগুলি কাব্য-সম্পদে অতুলনীয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এখন, এই অপূর্ব্ব চিত্রখানি আপনারা পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন কি? কারণসলিলে অনন্ত-শেষ-শয্যায় শুইয়া ভগবান্ বিষ্ণু যোগনিদ্রায় আচ্ছন্ন আছেন। তাঁহার নাভিকমলে পদ্মযোনি ব্রহ্মা সমাসীন রহিয়াছেন। এমন সময়ে বিষ্ণুর কর্ণমলোদ্ভূত মধু-কৈটভনামক দৈত্যদ্বয় প্রাদুর্ভূত হইয়া 'ব্রহ্মাণং হন্তুমুদ্যতৌ'—ব্রহ্মাকে হনন করিতে উদ্যত হইল। ব্রহ্মা বিপন্ন হইয়া যোগনিদ্রার স্তব করিয়া বিষ্ণুকে জাগাইলেন। বিষ্ণু জাগিয়া দৈত্য দু'টার সঙ্গে লড়াই করিলেন। দৈত্যযুগল প্রসন্ন হইয়া বিষ্ণুকে বলিলেন, "আমরা খুসী হইয়াছি; তুমি আমাদের কাছে বর লও।" বিষ্ণু বলিলেন, "তোমরা আমার বধ্য হও।" এ গল্পটার রহস্য কি? আমরা যে শব্দ-বিজ্ঞানের আলোচনা এই দুই দিন ধরিয়া করিতেছি তাহারই গোড়ার কথা কয়টি এই গল্পের মধ্যে লুকান রহিয়াছে। বিষ্ণু সর্ব্বব্যাপী আত্মা বা চৈতন্য। তিনি এক বই, দুই নহেন। কিন্তু এক এক হইয়া থাকিলে ত সৃষ্টি হয় না। সৃষ্টির জন্য নিজেকে যেন বিভক্ত করিয়া দুই করিয়া লইতে হয়। তাঁহার এক ভাগ বা দিক্ (aspect) হইল আধার বস্তু; অপর ভাগ বা দিক্ হইল আধেয় বস্তু। অনন্ত-শেষ-শয্যা এই জাগতিক আধার বস্তুর সঙ্কেত; এবং সে বিরাট্ আধার বস্তু একটা

অপরিসীম শক্তিব্যূহ (an infinite system of stresses)। আমরা মনে করি, বুঝিবা এই জলবিন্দুটিকে গোটা দু'চার শক্তি গড়িয়া ধরিয়া রহিয়াছে; আমাদের হিসাবের সম্ভাবনা ও সুবিধার জন্য আমাদিগকে ব্যাপারটাকে নিতান্ত ছোট করিয়া দেখিতে হয়; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে যে আধারশক্তি জলবিন্দুর অণু-পরমাণু প্রভৃতিকে ধরিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছে, সেটা ব্রহ্মাণ্ডের নিখিল শক্তিব্যূহ ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না। জলবিন্দু কি জলবিন্দুরূপে বাহাল থাকিত, যদি তাহাকে পৃথিবী, বাতাসের রেণু প্রভৃতি টানিয়া ও চাপিয়া ও ধরিয়া না রহিত? পৃথিবী ও তার এত সাজ-সরঞ্জাম কি সম্ভবপর হইত, যদি সৌরজগতের ও ব্রহ্মাণ্ডের অপরাপর দ্রব্য তাহাকে টানিয়া ও চাপিয়া ও সামলাইয়া না রহিত? এইপ্রকার টানিয়া, চাপিয়া রাখার নাম আমরা এক কথায় দিয়াছি শক্তিব্যূহ (stress)। অতএব জগতে এমন কোনও কিছু ছোট বা অল্প নাই যাহার আধার-শক্তিকে আমরা অনন্ত-শেষ-শয্যারূপে ভাবিতে না পারি। কারণ, আমরা দেখিতেছি যে, তাহার আধার-শক্তি (constituting forces) নিখিল-শক্তি-ব্যূহের এক তিলও কম নহে। তুমি আমি অল্পই দেখিতে শিখিয়াছি, তাই অল্পর মূলে ও অল্পকে ঘিরিয়া যে ভূমা ও বিরাট্ রহিয়াছে, তাহাকে সহজে ধরিতে ছুঁইতে পারি না। বিজ্ঞান অনেক মাথা ঘামাইয়া পৃথিবী ও আতাফলের টানাটানির একটা বিবরণ দিল; বিবরণ খাসা হইয়াছে দেখিয়া আমরা আহ্লাদে আট্খানা হইতেছি। কিন্তু ভুলিয়া যাই যে, শুধু-একটা গণিতের ফরমাসী আতাফল ও পৃথিবী লইয়াই এ বিশ্বের কাণ্ড-কারখানাটা চলিতেছে না। দুইটা ছাড়িয়া তিনটা জিনিষের টানাটানি বুঝিয়া-পড়িয়া লইতে ল্যাপ্লাসের মত মাথাও ঘুরিয়া যায়; নিখিল শক্তিব্যূহের বিবরণ দিবে কে? বিবরণ দিতে পারি আর নাই পারি, তাহাই কিন্তু ছোট, বড়, মাঝারি সকলেরই মূলে; আব্রহ্মস্তম্ব

পর্য্যন্ত ব্রহ্মাণ্ডটাকে বিষ্ণু আধার-শক্তিরূপে ধরিয়া রাখিয়াছেন ; সেই আধারশক্তির সঙ্কেত অনন্তশয্যা।

তারপর নাভি-কমল। তাহার উপর ব্রহ্মা বসিয়া আছেন। কে ব্রহ্মা ? তিনি শব্দব্রহ্ম বা ব্রহ্মের শব্দ-প্রবাহরূপে অভিব্যক্তি। এই অভিব্যক্তি যাঁহাকে আধার ও আশ্রয় করিয়া হইতেছে তিনি সর্ব্বব্যাপী আত্মার অথবা বিষ্ণুর অনন্ত-শয্যাস্তীর্ণ মূর্ত্তি—সেই নিখিল শক্তিব্যূহ (সহস্রশীর্ষ, সহস্রাক্ষ, সহস্রপাৎ) যাহার কথা আমরা এতক্ষণ ধরিয়া বলিতেছি। ঘড়ি বাজিয়া উঠিল ; এই বাজা ব্যাপারের মূলে ঘড়ির ভিতরকার চাকাগুলির, দোলক প্রভৃতির শক্তিগুলি (forces) রহিয়াছে ; শুধু ভিতরকার হিসাব দিয়াই আমাদের রেহাই নাই ; বাহিরের তাপ, আলোক, তাড়িত-চৌম্বক-শক্তি ও অপরাপর দ্রব্যের আকর্ষণ, এই বাজা ব্যাপারের পিছনে অবশ্যই রহিয়াছে। তবেই ঘড়ি যখন বাজিতেছে তখনও তাহার মূলে সেই অনন্তদেবই রহিয়াছেন, যাঁহার সহস্র শীর্ষ, সহস্র অক্ষি প্রভৃতি বেদবাণী আমাদের বারবার শুনাইতেছেন। এই দৃষ্টান্ত বুঝিলে আমরা বুঝিব কেন, শব্দব্রহ্মরূপ ব্রহ্মাকে অনন্তশয্যাস্তীর্ণ বিষ্ণুর নাভিকমলে বসাইয়া রাখা হইল। গল্পটা শুনিতে আজগবি, কিন্তু ইহা সৃষ্টির বা অভিব্যক্তি-প্রবাহের মূল কথাটির দিব্য প্রতীক, এ কথা আমাদের ভুলিলে চলিবে না। নাভি-বিবর হইতে পদ্মমৃণাল উদ্গত হইয়া আমাদিগকে ইহাই সঙ্কেতে জানাইতেছে যে, ব্রহ্মা শব্দব্রহ্ম ; কারণ সকলপ্রকার শব্দাভিব্যক্তির মূলে যে নাদ বা প্রণবোচ্চার, তাহা ত নাভিস্থানকে বিশেষতঃ আশ্রয় করিয়াই হইয়া থাকে। নাদধ্বনি যে নিখিলধ্বনি-বৈচিত্র্যের মূল উৎস। প্রণবের আলোচনা-স্থলে এ কথাটির আমরা বিশেষভাবে আলোচনা করিব। আপাততঃ নাভিকমলে শব্দব্রহ্মরূপ ব্রহ্মা কেন বসিলেন তাহার একটা কৈফিয়ৎ আমরা পাইলাম। সর্ব্বব্যাপী আত্মা বা চিন্ময় নিজকে যেন দুইভাগে

বিভক্ত করিয়া, একভাগে নিখিল-শক্তিব্যূহ-স্বরূপ আধার বা আশ্রয় হইলেন; অপরভাগে নিখিল-বেদশব্দাত্মক কলেবর ধরিয়া আধেয় বা আশ্রিত হইলেন। শব্দের স্রষ্টৃত্ব আমরা পূর্ব্বেই কয়েকটি দৃষ্টান্ত লইয়া বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। শব্দের এই প্রকার সৃষ্টি-সামর্থ্য স্মরণ রাখিলে, আমাদের আর গোল হইবে না, কেননা বিষ্ণুর নাভি-পদ্মোপরিস্থিত শব্দব্রহ্মকে সৃষ্টির মালিক করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাই ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা। তাঁহার ধ্যানে নিখিল বেদশব্দ আবির্ভূত হয়; সেই বেদশব্দপূর্ব্বক সৃষ্টি হইয়া থাকে—জগৎ সেই শব্দ-প্রভব। বেদশব্দ মানে স্বাভাবিক শব্দ, এটা যেন মনে থাকে; অর্থাৎ কোনও পদার্থের মূলীভূত চাঞ্চল্য পারমার্থিক কর্ণে শ্রুত হইলে যে বিশুদ্ধ, নিরতিশয় শব্দ হয়, তাহাই; আমরা যেগুলিকে বেদশব্দ বলিয়া কহিতেছি ও শুনিতেছি, ঠিক সেগুলি নহে। আমাদের আপ্ত (inspired, revealed) শব্দগুলিতেও অল্পবিস্তর বিকৃতি ও সাঙ্কর্য্য হইয়াছে।

ব্রহ্মা শুধু আধার-কমলে বসিয়া আছেন এমন নহে; তাঁহার একটা বাহনও আমরা জুটাইয়া দিয়াছি; সেটা হংস। হংসটা কি? কোনওপ্রকার শব্দ উচ্চারণ ও শ্রবণ করিতে যাইলে প্রাণশক্তির পরিস্পন্দ (vital functioning) যে আদৌ হয়, সে পক্ষে হালের বিজ্ঞানও আর সন্দেহ রাখে না। সেই প্রাণন ব্যাপারের স্বাভাবিক শব্দ ও বীজমন্ত্র হংস; প্রাণিমাত্রেই, শুধু মানুষে নয়। গভীর রাত্রিতে জাগিয়া স্থির হইয়া বসিয়া শুনিলে আমাদের শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দটাকে মোটামুটি (roughly) 'হংস' বলিয়াই মনে হয়। সাধকের দিব্যকর্ণে প্রাণনক্রিয়ার, যে প্রায় বিশুদ্ধ ধ্বনি (approximate acoustic equivalent) ধরা পড়ে, তাহা যে সত্য সত্যই 'হংস' সে বিষয়ে শাস্ত্র, গুরু ও মহাজনেরা একবাক্যে সাক্ষ্য দিতেছেন। হাতে-কলমে পরীক্ষা করিয়া দেখার জিনিষ; শুনিয়াই মাথা নাড়িয়া

বিশ্বাস বা অবিশ্বাস প্রকাশ করায় কোনই লাভ নাই। বাহনের পরিচয় ত পাইলাম। বাগ্‌দেবী সরস্বতীর বাহনও হংস এ কথাও আপনারা স্মরণ রাখিবেন। বিরিঞ্চির হস্তে আবার অক্ষসূত্র। ইহা বর্ণমালা অর্থাৎ শব্দসমূহের মৌলিক অংশগুলি (units or elements of sounds)। যথা 'গৌঃ' এই শব্দে গকারৌকার-বিসর্জ্জনীয়াঃ, গ, ঔ, ঃ। মহামেঘপ্রভা ঘোরা মুক্তকেশী চতুর্ভুজা, অপর কোন দেবতার গলদেশে ইহাই মুণ্ডমালারূপে দুলিয়াছে। আসলে কিন্তু ইহা মাতৃকা—বর্ণময়ী। কমণ্ডলু, চতুরানন প্রভৃতির বিবরণ দিতে যাইলে আমাদের পুঁথি আর শেষ হইবে না। আপাততঃ শব্দের দিক্ হইতে মোটা মোটা আরও দু'টো-একটা কথা আমরা ভাবিয়া দেখিব। নাদ-ধ্বনি প্রধানতঃ নাভিস্থানে উত্তেজনা বিশেষ হইতে সঞ্জাত হয়, এবং বাহন হংস প্রাণন ক্রিয়ার শাব্দিক মূর্ত্তি—এই দুইটি কথা মনে রাখিলে, আমাদের আর বুঝিতে বাকি থাকিবেনা যে, শব্দব্রহ্ম অথবা ব্রহ্মা শব্দ-তন্মাত্রবপুঃ, অর্থাৎ নিরতিশয় ও বিশুদ্ধ শব্দসমষ্টিই ব্রহ্মার কলেবর; আর, তিনি যাহার উপর আশ্রয় করিয়া এবং যাহাকে বাহন করিয়া রহিয়াছেন, সেই নাভিকমল ও হংস স্পন্দাত্মক পরশব্দের প্রতিমূর্ত্তি। অতএব স্পন্দাত্মক পরশব্দকে মূল করিয়া শব্দতন্মাত্র, সূক্ষ্মশব্দ ও স্থূলশব্দ এই ত্রিবিধ অপরশব্দের যে ব্যাখ্যা আমরা দিয়াছিলাম, তাহার একটা সাঙ্কেতিক বিবরণ (symbolic representation) গল্পটার মধ্যে আমরা পাইলাম। আপাততঃ গল্প বলিয়াই চালাইতেছি, কিন্তু ঠিক গল্প ইহা নহে। বিষ্ণু সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বাধার আত্মা। ব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছুর অভিব্যক্তি হইতেছে তাহার মূল বিষ্ণুতে। বিষ্ণুই অভিব্যক্ত হইতেছেন। আমরা যাঁহাকে বিষ্ণু আখ্যা দিতেছি তাঁহাকে, বৈজ্ঞানিকের তরফের উকিল হার্বার্ট স্পেন্সার হয়ত 'অজ্ঞেয় শক্তি' (Inscrutable Power) বলিয়া ছাড়িয়া দিবেন। নাম যাহাই দেওয়া হউক, বিষ্ণুই বলি আর আত্মাশক্তিই বলি,

এই বিশ্বাভিব্যক্তির মূলে ও অন্তরালে একটা কিছু রহিয়াছে। নিখিল সৃষ্টির সম্ভাবনা, সূচনা ও প্রেরণা তাহারই ভিতরে। সেই বস্তুটি শব্দতন্মাত্ররূপে, শব্দপরাকাষ্ঠারূপে অভিব্যক্ত হইতেছেন—অর্থাৎ, প্রজাপতি ব্রহ্মা সেই মূলবস্তু হইতে আবির্ভূত হইতেছেন। সেরূপ আবির্ভাবের জন্য পরশব্দের আবশ্যকতা যে আছে তাহা পূর্ব্বেই আমরা বলিয়া রাখিয়াছি। কিন্তু পরশব্দ থাকিলেই হইবে না, দু'টো একটা বাধা বা অন্তরায় অতিক্রম না করিতে পারিলে সেরূপ অভিব্যক্তি হইবে না। আমি শব্দ শুনিতেছি; আমার শ্রুত শব্দ নিরতিশয় শব্দ বা শব্দপরাকাষ্ঠা নহে। কেন নয়? পূর্ব্ব-প্রবন্ধে আমরা শব্দ শোনার যে সমস্ত উপাদান ও নিমিত্তের আলোচনা করিয়া রাখিয়াছি, তাহাতে এই কথাটা পরিষ্কার হইয়াছে যে আমার শোনা শব্দতে বিকার (deformation) ও সঙ্কর (confusion), এই দুইটি দোষ অল্পবিস্তর থাকিবেই।

আমার স্থূল, ভৌতিক কর্ণ অবিকৃত ও অসঙ্কীর্ণ শব্দ গ্রহণ করিতে যোগ্য নয়। আমার ভিতরে যে বিষ্ণু রহিয়াছেন তাঁহার ইহাই কর্ণ-মল। এই কর্ণমল রহিয়াছে বলিয়া, আমার শ্রবণ-সামর্থ্যের এই ত্রুটি ও দোষ রহিয়াছে বলিয়া, আমি নিরতিশয় শব্দ বা স্বাভাবিক শব্দ শুনিনা; এইজন্ত আমার শোনা শব্দ স্থূল শব্দ, শব্দতন্মাত্র নহে; আমার কর্ণ ভৌতিক কর্ণ, পারমার্থিক কর্ণ (absolute ear) নহে। শব্দ শোনার সামর্থ্য আমার মধ্যে পরাকাষ্ঠায় পৌঁছিতে পারে নাই; পারে নাই তার প্রমাণ, আমায় কাণে যন্ত্র লাগাইয়া অথবা ধ্যানস্থ হইয়া অনেক অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম শব্দ শুনিতে হয়। অভিব্যক্তির ধারা কোনও একটা বাধাতে ধাক্কা পাইয়া যেন থামিয়া রহিয়াছে, শেষ-পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারে নাই। সর্ব্বভূতের মধ্যেই অভিব্যক্তির এই দশা দেখি। যতটা অভিব্যক্তি হইলে সম্পূর্ণতা হয়, পরাকাষ্ঠা হয়, তাহা এখনও কোথাও হইয়াছে দেখি না। কি যেন একটা কি

প্রতিবন্ধক রহিয়াছে, ষোল আনা ফুটিয়া উঠিতে দিতেছে না। আমার শ্রবণ সামর্থ্যের এই যে দোষ বা প্রতিবন্ধক তাহাকে কর্ণমল বলিলে, বেশ বলা হয় না কি? বিষ্ণু মানে সর্ব্বব্যাপী; কাজেই যেখানে কর্ণ বা শ্রবণ-সামর্থ্যের আয়োজন বা ব্যবস্থা, সেইখানেই এই বিষ্ণু-কর্ণমল। অর্থাৎ কর্ণমল শুধু তোমার আমার ঘরওয়া কথা নহে, ইহা একটা জাগতিক ব্যবস্থা। তবে তোমার আমার দৃষ্টান্তে মূল তথ্যটি বুঝিবার সুবিধা আমাদের হইতে পারে। এখন, আমি যদি শ্রবণ সামর্থ্যের পরাকাষ্ঠায় উপনীত হইতে চাই, তবে অবশ্য আমাকে কর্ণ-মল পরিষ্কার করিয়া লইতে হইবে, আমার ভৌতিক কর্ণটাকে পারমার্থিক কর্ণ করিয়া লইতে হইবে। কর্ণ নির্ম্মল না হইলে শ্রবণ নিরতিশয় ও বিশুদ্ধ হইবে না। আমরা যে সকল লক্ষণ ও পরিভাষা করিয়া লইয়াছি, তাহাতে, এ সকল কথা বলিয়া আমরা একটা কথাই ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতেছি মাত্র। কর্ণমল বা শ্রবণশক্তিনিষ্ঠ দোষ দুই কারণে হইতে পারে, অথবা তাহার বিবৃতি দুই প্রকারে দেওয়া যাইতে পারে। আবরণ ও বিক্ষেপ—তমঃ ও রজঃ। শব্দ হইল, অপরে শুনিতে পাইল, আমি পাইলাম না; এ ক্ষেত্রে কি যেন শব্দটাকে আমার কাছ হইতে ঢাকিয়া রাখিয়াছে; এই আবরণের জন্য বহু সূক্ষ্ম শব্দ আমি শুনি না, অনেক বিপুল শব্দও আমি শুনি না; দুইটি সীমা রেখার মধ্যে, একটা গণ্ডীর ভিতরে শব্দ আসিয়া হাজির হইলে, তবে আমি তাহাকে শুনিতে পাই। ইহার পরিভাষা করা হউক—তামসিক কর্ণমল। আবার শব্দ শুনিলেও ঠিকভাবে শোনার সম্ভাবনা আমার নাই। একই সময়ে নানা জিনিষের উত্তেজনা নানা শব্দ জন্মাইতেছে। বাগানে বসিয়া রহিয়াছি—কাকের ডাক, ঝিঁঝিঁর ডাক, চিলের ডাক প্রভৃতি কত শত শব্দ যে মাখামাখি জড়া-জড়ি করিয়া আমার কাণে আসিতেছে, তার হিসাব কে দিবে?

প্রকৃতপ্রস্তাবে যে তাহারা মাখামাখি করিয়া, সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছে, সে পক্ষে আর সন্দেহ আছে কি ? জলে একটা ঢেলা ফেলিলাম ; একটা উত্তেজনার কেন্দ্র হইতে চারিধারে সুশৃঙ্খলার সহিত ঢেউগুলি কেমন ছড়াইয়া পড়িতেছে। আর একটা ঢেলা ফেলিলাম ; নূতন একটা উত্তেজনার কেন্দ্র হইল, এবং তাহাকে বেড়িয়া আরও এক সার ঢেউ ছড়াইয়া পড়িল। কিন্তু পূর্ব্বের ঢেউগুলি তখনও মিলাইয়া যায় নাই। নূতনের সঙ্গে পুরাতনের সঙ্ঘর্ষ হইল, ফলে, নূতন ও পুরাতন উভয়েই নিজস্ব প্রকৃতি ও শৃঙ্খলা হইতে অল্প-বিস্তর বিচ্যুত হইল। ইহা তাহাদের সাঙ্কর্য্য (interference of waves)। আমাদের শ্রুত শব্দগুলির এইরূপই দশা। কোন একটা জিনিষের নিজস্ব প্রকৃতি আমরা শব্দে তাই ধরিতে পারিতেছি না ; যেটাকে কোন জিনিষের শব্দ বলিতেছি সেটা নিশ্চয়ই তাহারই নিজস্ব ও স্বাভাবিক শব্দ নহে। এ বিশ্বের হাটে সকলেই ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি করিতেছে ; এ হট্ট-গোলের মধ্যে আমার হারানো মামার গলা বাছিয়া লওয়া আমার পক্ষে এক রকম অসম্ভবই হইয়া পড়িয়াছে। তবে অবশ্য 'অধ্যেতৃবর্গ-মধ্যস্থ-পুত্রাধ্যয়ন-শব্দবর্ৎ' মামার ডাক একবারে যে না শুনিতেছি এমন নহে ; সে ডাক আর পাঁচটা ডাকের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া গা-ঢাকা দিয়া রহিয়াছে। জগতের নিখিল সামগ্রীর যে ক্ষেত্রে গোলে হরিবোল দিবার ব্যবস্থা, সে ক্ষেত্রে আমি বিকৃত, ভেজাল শব্দ শুনিতেই বাধ্য। ভেজাল ধরিয়া সংশোধন করিয়া লইবার সামর্থ্য আমার কর্ণের নাই। ইহা কর্ণের আর এক দোষ—ইহার নাম দিই রাজসিক কর্ণমল। এই কর্ণমলের দরুণ শোনা শব্দগুলিও গোল পাকাইয়া যাইতেছে—প্রকৃতি বা স্বভাব হইতে বিচ্যুত, বিক্ষিপ্ত হইতেছে। এই দুই প্রকার কর্ণমলের একটা মধু, অপরটা কৈটভ ; একটা তমঃ, অপরটা রজঃ। এই কর্ণমলের সংস্কার না হইলে, কি আমাতে, কি তোমাতে, কি প্রজাপতিতে, পারমার্থিক কর্ণ অথবা শব্দ-

গ্রহণ-শক্তি-পরাকাষ্ঠা অভিব্যক্ত হইতে পারে না। বিষ্ণু, প্রজাপতি বা ব্রহ্মারূপে নিখিল স্বাভাবিক বা বৈদিক শব্দরাশি অভিব্যক্ত করিতে যাইতেছেন ; সেরূপ অভিব্যক্তি হওয়ার কোনই সম্ভাবনা নাই, যতক্ষণ কর্ণমল রহিয়াছে। রূপকচ্ছলে বলা হউক, কথাটা কিন্তু সোজা, এবং কথাটায় আপত্তি করার কিছু নাই। অভিব্যক্তিধারা (stream of evolution) কে পরাকাষ্ঠায় পৌঁছিতে হইলে, সকল গণ্ডী, সকল বাঁধাবাঁধি অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে, এ কথা বলিলে উক্তেরই শুধু পুনরুক্তি করা হয় মাত্র। যে নির্ম্মল হইবে তাহাকে ময়লা ধুইয়া মুছিয়া ফেলিতে হইবে, এ কথা বলিলে নূতন কোন কথা বলা হয় কি ? তুমি জলে ঢেলা ফেলিয়া দিলে, আমাকে তার শব্দ শুনিতে হইলে কাণ হইতে আঙুল সরাইয়া লইতে হইবে। সেইরূপ কারণসলিলে যে চাঞ্চল্য, তাহাকে নিরতিশয়ভাবে শুনিবার প্রয়োজন হইলে, শ্রবণ সামর্থ্যের কুণ্ঠা ও কৃপণতা, অর্থাৎ কর্ণমল, থাকিলে ত চলিবে না ! এই জন্য প্রাজাপত্য অধিকার নিরুদ্বেগ করিতে হইলে কর্ণমল দূর করাই চাই। এই জন্যই শাস্ত্র বলিতেছেন মধু কৈটভ '.বিষ্ণুকর্ণমলোদ্ভূতৌ ব্রহ্মাণং হন্তুমুদ্যতৌ'। দৈত্যদ্বয় বিনষ্ট না হইলে, অর্থাৎ কর্ণমল বিদূরিত না হইলে, ব্রহ্মার পদবী, অর্থাৎ নিরতিশয়-শ্রবণ-সামর্থ্য, অক্ষুণ্ণ ও চরিতার্থ হইতে পারে না। বিষ্ণুর যোগনিদ্রা না হইলে আবার দৈত্য দুইটার প্রাদুর্ভাব হয় না।

বীজের মধ্যে যাহা প্রসুপ্ত ও প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়াছে তাহা যদি জাগ্রত ও পরিস্ফুট হইয়াই থাকিত, তবে ত বীজ গাছ হইয়াই রহিত। বীজ হইতে ধীরে-ধীরে অঙ্কুর এবং অঙ্কুর হইতে ধীরে-ধীরে গাছ হইতেছে—এই ক্রমিক ও ধারাবাহিক ব্যাপারটারই তাহা হইলে কোনই অর্থ থাকিত না। অভ্যুদয় বা ক্রমবিকাশ নামক প্রবাহটা তাহা হইলে নিরর্থক হইয়া রহিত। বীজের মধ্যে যে বিষ্ণু রহিয়াছেন, যে বৈষ্ণবী-শক্তি রহিয়াছেন, তিনি নিদ্রিত রহিয়াছেন বলিয়াই বীজ

আপাততঃ বীজই হইয়া রহিয়াছে; সে শক্তির নিদ্রা, অর্থাৎ মূর্চ্ছিতাবস্থা (potential condition) যেমন যেমন অপগত হইবে, বীজের পাদপরূপে পরিণতিও তেমনি তেমনি প্রকৃত হইতে থাকিবে। এই জন্য সর্ব্বভূতান্তরাত্মা বিষ্ণু না ঘুমাইলে ও জাগিলে কোনও জিনিষের বাড়া-কমা, উদয়-বিলয়ের প্রসঙ্গই অর্থহীন হইয়া যায়। জিনিষের হ্রাস বৃদ্ধি মানেই তার ভিতরকার শক্তিব্যূহের বিভিন্ন অবস্থা। বিশ্বের উদয় বিলয় হইতেছে দেখিয়াই আমরা ভাবিতেছি যে, যে বস্তুটি বিশ্বের বীজ বা মূলরূপে রহিয়াছেন, তাঁহার একরকম সঙ্কোচ ও বিকাশ যেন আছে। জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি এই ত্রিবিধ শক্তি, অথবা নিখিল শক্তির আশ্রয় যে জগন্নিবাস, তাঁহার অনন্ত শক্তিব্যূহ সকল সময়ে ঠিক একভাবে থাকিলে, কোনরূপ চলা-ফেরা, হ্রাস-বৃদ্ধি, উদয়-বিলয় সম্ভবে না, সুতরাং সৃষ্টি অথবা জগৎ বলিলে যাহা বুঝি সেটা আদৌ সম্ভবপর হয় না। এটা বিজ্ঞানের পরীক্ষিত ও স্বীকৃত কথা, দর্শন-শাস্ত্রের দুর্বোধ্য হেঁয়ালি নহে। বিজ্ঞান যাহাকে কার্য্যকরী শক্তি (Energy) বলেন, তাহার দুইটি অবস্থা আমরা দেখিতে পাই। একটা প্রচ্ছন্নাবস্থা (potential বা static condition); অপরটা উদার বা ব্যক্ত অবস্থা (kinetic condition)। জলের কণিকাগুলি নূতনভাবে বিন্যস্ত ও সজ্জিত হইলে বরফ হইল; এই অভিনব বিন্যাসের (new configurationএর) ফলে বরফের উৎপত্তিতে প্রচুর তাপ প্রচ্ছন্নভাবে থাকে; আবার বরফ যখন গলিয়া জল হইতে থাকিবে তখন সেই প্রচ্ছন্ন তাপশক্তি হিসাবে ধরা পড়িয়া যাইবে। পুনশ্চ, জল যখন বাষ্পে পরিণত হয়, তখনও ঐ প্রকার একটা অবস্থা হয়। জলের ভিতর যে বিষ্ণু রহিয়াছেন তিনি সব সময়ে ঠিক এক অবস্থায় থাকিলে জল জলই রহিয়া যায়, বরফ বা বাষ্প হইতে পারে

মধ্যেও রহিয়াছেন; আমার ভিতরে যিনি রহিয়াছেন, তিনি সব সময়ে ঠিক সমবস্থ হইয়া থাকিলে আমিও সব সময়ে সমবস্থই রহিয়া যাইতাম। আমার জ্ঞান ও কর্ম্ম সব সময়ে ঠিক এক ভাবেই হইত; হয় না যে, ইহাতেই বুঝিতেছি, আমার মূলে একটা পরিবর্ত্তনের ও ক্রমিকতার বন্দোবস্ত রহিয়াছে; আমার জ্ঞান ও শক্তি যে অল্প ও সঙ্কীর্ণ হইয়া রহিয়াছে, ইহাতেই বুঝিতেছি, অথবা এই ব্যাপারটাকে বলিতেছি, যে, বিষ্ণু আমার মধ্যে যোগনিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছেন। আমার অভিভূতাবস্থাই আমার বিষ্ণুর যোগনিদ্রা। আমার যে ক্রমিক বিকাশ বা অভ্যুদয় তাহাই আমার বিষ্ণুর জাগরণ। শুধু আমার বেলায় নয়, নিখিল ব্রহ্মাণ্ডেই এই প্রকার ব্যবস্থা হইয়া রহিয়াছে। রহিয়াছে বলিয়াই জগৎ, জগৎ। রহিয়াছে বলিয়াই সৃষ্টি হইতেছে, বিকাশ হইতেছে। এই জাগতিক রহস্য ও সৃষ্টির গোড়ার কথাটি স্মরণ রাখিলে, বিষ্ণুর যোগনিদ্রা ও প্রবোধ, এই পৌরাণিক গল্প শুনিয়া আর হাসিব না। কার্য্যকরী শক্তির (Energyর) ব্যক্তাবস্থা ও অব্যক্তাবস্থা শুনিয়া বৈজ্ঞানিক হাসিয়া থাকেন কি ?

ঘুমাইয়া থাকিলেই জাগা হয়, নামিয়া থাকিলেই উঠা হয়। বিষ্ণু কারণসলিলে যোগনিদ্রায় নিদ্রিত আছেন। ইহা যেন বিশ্ব-শক্তির একটা মগ্ন ও মূর্চ্ছিত অবস্থা (static condition)। এ ভাবটা সব সময়ে থাকিলে কোনও পরিণতি ও পরিবর্ত্তন অবশ্য থাকে না। যে ধারাটিকে সৃষ্টি বলিতেছি সেটি আর আদৌ চলে না। বিষ্ণু আর ব্রহ্মারূপে, সৃষ্টিকর্ত্তাভাবে দেখা দিতে পারেন না। ব্রহ্মাতে শব্দগ্রহণ সামর্থ্যের যে পরাকাষ্ঠা, বিশুদ্ধ স্বাভাবিক শব্দ বা বীজমন্ত্র শুনিবার ও বলিবার শক্তির যে চরমোৎকর্ষ, তাহা সম্ভবে না যদি বিষ্ণু যোগনিদ্রা হইতে উত্থিত না হন। বীজের শক্তির ব্যক্তাবস্থা মানেই অঙ্কুরাদির উদ্গম। যোগনিদ্রাবস্থাতেই কর্ণমল সম্ভবে; সেই অবস্থাতেই মধুকৈটভের প্রাদুর্ভাব। ব্রহ্মা স্তব করিয়া যোগনিদ্রা

ভাঙ্গিলেন—প্রচ্ছন্নকে (potentialকে) উদার (kinetic) করিয়া লইলেন। যোগনিদ্রাভঙ্গে কর্ণমল, অর্থাৎ শ্রবণ-সামর্থ্যের অল্পতা ও কৃপণতা, অপগত হইল। মধুকৈটভের সংহার হইল। মধুকৈটভ শব্দের বিকার ও সঙ্কর। শব্দের বিকার ও সঙ্কর ঘুচিয়া গেলেই শব্দ বিশুদ্ধ ও স্বাভাবিক হইল। বীজমন্ত্রগুলির উদ্ধার ও চৈতন্য হইল। এইরূপ সমর্থ (dynamic ও creative) বীজমন্ত্রগুলি না পাইলে ত সৃষ্টি হইবে না, ব্রহ্মার অধিকারই সাব্যস্ত হইবে না। মধুকৈটভ বিনাশের পর ব্রহ্মা নিরুদ্বেগ ও চরিতার্থ হইলেন।

মধুকৈটভের আখ্যায়িকার ভিতরে শব্দের পূর্ব্বালোচিত সব-কয়টা আসল কথা পাইলাম ত? আখ্যায়িকাটির এরূপ ব্যাখ্যাই আমরা দিতেছি কেন? কোন আখ্যায়িকার রহস্যোদ্‌ঘাটন করিতে বসিয়া প্রথমেই ধীরভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হয়, তাহার মধ্যে কোনও নির্দ্দেশসূত্র, স্পষ্ট সঙ্কেত, অথবা দিগ্‌দর্শন (sign post) প্রচ্ছন্নভাবে দেওয়া আছে কি না। বর্ত্তমান আখ্যায়িকায় সেরূপ সঙ্কেত তিনটি। প্রথম সঙ্কেত ব্রহ্মার ধ্যানে নিখিল বেদশব্দ প্রাদুর্ভূত হইতেছে। কাজেই ব্রহ্মা শব্দসম্পর্কীয় শক্তির পরাকাষ্ঠা; বেদশব্দ মানে বিশুদ্ধ ও নিরতিশয় শব্দ। এইরূপ শব্দকে, অর্থাৎ বীজমন্ত্রকে, পুরোহিত করিয়াই ব্রহ্মার সৃষ্টিযজ্ঞ আরম্ভ হইয়া থাকে, অন্যথা, হয় না। মধুকৈটভ যে কাহারা তাহা বুঝাইয়া দিবার জন্য অতি স্পষ্ট সঙ্কেত রহিয়াছে—বিষ্ণুকর্ণমলোদ্ভুতৌ। বস্তুতঃ 'কর্ণমল' এই শব্দটিই এ মহারহস্য-পেটিকার চাবিকাটি। তার পর ব্রহ্মা যোগনিদ্রার প্রবোধনের জন্য যে স্তব করিলেন, তাহা যে মুখ্যতঃ বাগ্‌দেবতার, শব্দব্রহ্মের স্তব; ব্রহ্মা শব্দব্রহ্ম হইবার জন্য পরমা বাকের স্তুতি করিতেছেন—সাধক তাঁহার সিদ্ধিকে বরণ করিয়া লইতেছেন। "ত্বং স্বাহা, ত্বং স্বধা ত্বং হি বষট্‌কারস্বরাত্মিকা। সুধা ত্বমক্ষরে নিত্যে ত্রিধা মাত্রাত্মিকা স্থিতা॥ অর্দ্ধমাত্রা স্থিতা নিত্যা যানুচ্চার্য্যা বিশেষতঃ।"

ইত্যাদি স্তব শুনিয়া আর সংশয় থাকে কি, কিসের এ স্তব, কেন এ স্তব ?

সেদিন আমরা গঙ্গার গোলোকধামে উৎপত্তি, ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে স্থিতি, হরজটাজালে অবগুণ্ঠন এবং শেষকালে গোমুখীদ্বারে ভূতলে অবতরণ—এই আখ্যায়িকাটিরও শব্দপক্ষে ব্যাখ্যা দিয়াছি। গোলোক ও গোমুখীর 'গো' শব্দ সেখানে আমাদের নির্দ্দেশসূত্র (guiding clue) ; আর ভগীরথ শঙ্খ বাজাইয়া অগ্রসর হইতে হইতে এই মহারহস্যটিরই ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন যে গঙ্গা বেদশব্দময়ী ; ভগীরথের ঐ শঙ্খধ্বনি ত শব্দসঙ্কেত ; এবং তাহাই গঙ্গামাহাত্ম্যের মর্ম্মকথা আমাদিগকে ডাকিয়া শুনাইয়া যাইতেছে। গুরুশিষ্য-পরম্পরাক্রমে বেদশব্দধারা, বীজমন্ত্রসমষ্টি কতক কতক তোমার আমার কাণে আসিয়া পৌঁছিতেছে ; কর্ণমলের দরুণ তাহার বিকৃতি ও সঙ্কর অবশ্যই কিছু হইয়াছে ; কিন্তু গুরুশিষ্যের অবিচ্ছিন্ন সম্প্রদায় না থাকিলে বীজশব্দগুলির যতটা বিকৃতি ও সঙ্কর হইত, সম্প্রদায় থাকায়, ততটা হইতে পারে নাই। আমাদের প্রচলিত শব্দ-গুলির নানাকারণে বিকৃত ও সঙ্কীর্ণ হওয়ার একটা রোগ আছে। সেদিন চিত্র আঁকিয়া এ রোগের একটা নিদান দিবার চেষ্টা করিয়াছি। কর্ণমল ও রসনামলের মাহাত্ম্যে আমাদের শ্রুত ও উচ্চারিত শব্দগুলি গোল পাকাইয়া ক্রমশঃই ভেজাল ও অস্বাভাবিক হইয়া পড়িতেছে। শব্দ যত অস্বাভাবিক হইবে ততই তাহা অশক্ত ও অসমর্থ হইতে থাকিবে। শব্দ হইবে অথচ বিষয়ের কোনও ঠিকানা থাকিবে না, বকিয়া মরিব, কিন্তু অর্থ অদৃষ্টে যুটিবে না। এইরূপ অসমর্থ (uncreative) শব্দ লইয়া জীবন-যাপন বকমারি, সাধন ও সিদ্ধি ত দূরের কথা। ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইলে ভগবান্ যুগে যুগে ধরাধামে অবতীর্ণ হন, একথা তাঁর নিজমুখে শুনিয়াছি। ধর্ম্মের ও সদাচারের

একটা আদর্শ (standard) আবার বাহাল করিয়া দিতে, তাঁহার আমাদের এই কর্ম্মক্ষেত্রে পদার্পণ। বিষ্ণু আসিলেন কিন্তু তাঁহার পাদোদ্ভবা গঙ্গা আসিলেন না, এমনটা হয় না। ধর্ম্মের গ্লানি দূর করিয়া আদর্শের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিবার জন্য আসিলেন বিষ্ণু ; আর শব্দ-বিভ্রাট্ দূর করিয়া স্বাভাবিক ও সমর্থ শব্দসমষ্টির ধারা পুনঃ বহাইয়া দিয়া জীবের সুখদা মোক্ষদা হইবার জন্য আসিলেন গঙ্গা। স্বাভাবিক শব্দ ও বীজমন্ত্রগুলি হারাইয়া ফেলিলে জীব তার অন্তরাত্মায় ইষ্টদেবতার জন্য মণিমণ্ডপ, রত্নসিংহাসন গড়িবে কি দিয়া ? কপিল আদিবিদ্বান্ শ্রুতি বলিতেছেন ; তাঁহা হইতে গুরু-শিষ্য-পরম্পরায় স্বাভাবিক শব্দরাশি, নিখিল বেদ প্রবাহিত হইতেছে ; সে ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিলেই কল্যাণ ও চরিতার্থতা। সগরপুত্রগণ মদোদ্ধত হইয়া সেই আদি বিদ্বানের অবমাননা করিল, ধর্ষণা করিল ; মানুষ, সেই আদি বিদ্বান্ হইতে আরম্ভ করিয়া যে স্বাভাবিক শব্দ ধারা গুরুশিষ্যপরম্পরায় বহিয়া আসিতেছে, তাহাকে উপেক্ষা করিল, তাহা হইতে ভ্রষ্ট হইল ; বলিল—"আমরা শ্রুতি-স্মৃতি মানিতে যাইব কেন ? বেদ যাহাকে স্বাভাবিক শব্দ বলিতেছে সেটাই যে স্বাভাবিক শব্দ তার প্রমাণ নাই ; আমাদের চলিত শব্দেরই বা দোষ কি ? আমরা এইগুলির দ্বারাই কাজ চালাইব।" এই অবিচারপূর্ব্বক, অপরীক্ষাপূর্ব্বক বিদ্রোহের ফলে শব্দসঙ্কর ও শব্দবিভ্রাট্ সীমা উপ্চাইয়া ভয়ানক হইল। সম্প্রদায়ে (traditionএ)ও শব্দসঙ্কর ছিল, তবে তার বাড়াবাড়ি হইতে পারে নাই, এবং সেটাকে সারিয়া লওয়ারও একটা ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু সম্প্রদায় মানিব না বলাতে, শব্দসঙ্কর আয় ছাড়াইয়া গেল ; সেরূপ শব্দসঙ্করের ফল নিষ্ফলতা, বৈয়র্থ্য। ইহাই সগরপুত্রগণের ভস্মত্ব-প্রাপ্তি, জীবসাধারণের পাতিত্য। ভগীরথ তপস্যা করিয়া, আবার সেই বীজশব্দময়ী সনাতনী বেদবাণীকে মঙ্গল-ভৈরব শঙ্খধ্বনি করিতে

করিতে এই পতিত ধরায় বরণ করিয়া লইয়া আসিলেন। পথিমধ্যে জহ্নুমুনি একবার সেই পুণ্যতোয়াকে পান করিয়া আবার বাহির করিয়া দিলেন, পদ্মাসুর পথ ভুলাইয়া অন্য পথে লইয়া যাইতে গেল। স্বাভাবিক শব্দরাশির মর্ত্ত্যে বাহাল থাকিয়া আমাদের চতুর্ব্বর্গ সাধন করার পথে দুইটি প্রধান বিঘ্ন বা অন্তরায়। বিস্মৃতি ও বিকৃতি। ভুলিয়া গেলে চলিবে না, আবার রূপান্তরিত, বিকৃত করিয়া ফেলিলেও চলিবে না। জহ্নুমুনি প্রথমটার সঙ্কেত, পদ্মাসুর দ্বিতীয়টার সঙ্কেত। তবে জহ্নুমুনি কেওকেটা নহেন, তাঁহার বিস্মৃতি যোগবিস্মৃতি, নির্বীজ সমাধিতে, তুরীয়ভাবে যে প্রকার বিস্মৃতি হয় সেই প্রকার বিস্মৃতি। সে ত অশব্দের অবস্থা, সে অবস্থায় শব্দের, এমন কি স্বাভাবিক শব্দেরও, কি স্মরণ থাকে? ইহা হইল শেষ থাকের অনুভূতি; ইহার সহিত নীচের থাকের অনুভূতিগুলির সম্বন্ধ একটা চিত্র-সাহায্যে বুঝিবার চেষ্টা করিলে লাভ বই ক্ষতি নাই।

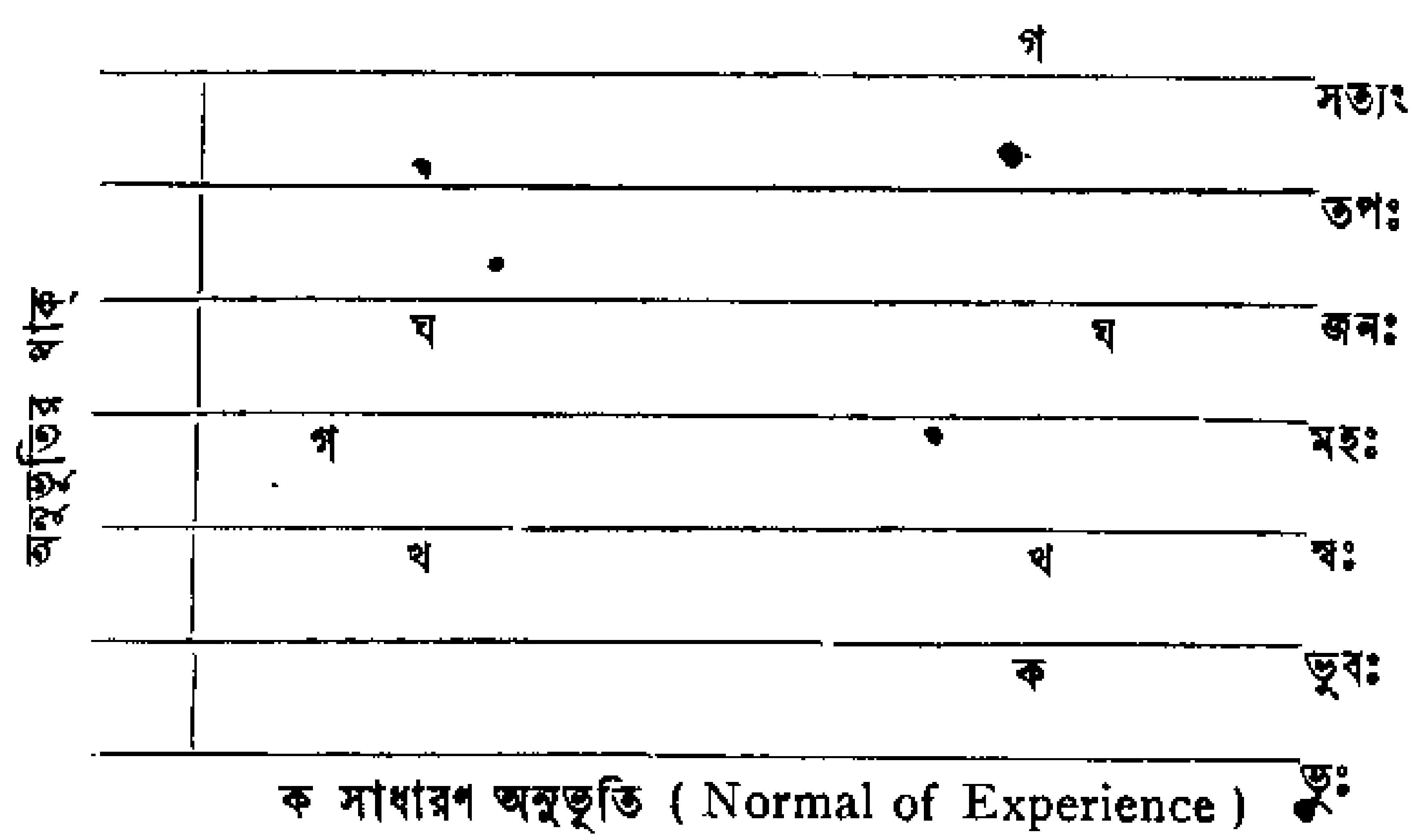

ক-রেখা আমাদের সাধারণ-অনুভূতির দ্যোতক রেখা (Curve of Normal Experience)। খ-রেখা যোগীদের অনুভূতির দ্যোতক রেখা (Curve of Yogik Experience)। গ-রেখা

এমন এক উচ্চ থাকের অনুভূতি বুঝাইতেছে, যেখান হইতে আর পুনরাবৃত্তি না হইতেও পারে। আত্মা সত্যস্বরূপের সন্ধান পাইয়া তাহাতেই 'শরবত্তন্ময়' হইয়াই থাকিয়া গেলেন, তাহার সংবাদ বহন করিয়া নিম্নলোকে আর নামিয়া আসিলেন না। আবার কোনও আত্মা অমৃতের আস্বাদ পাইয়া আমাদিগকে তাহার কথা শুনাইবার জন্য সাধ করিয়া যেন আমাদের থাকে নামিয়া আসিলেন—শাস্ত্র রচিয়া জীবশিক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। ইঁহারাই মন্ত্রদ্রষ্টা ও মন্ত্রবক্তা ঋষি। ইঁহারাই গুরু। গ-রেখা দ্বারা এমন এক আত্মার গতি ও পদবী আমরা দেখাইয়া দিলাম, যিনি আর নামিয়া আসিলেন না। ঘ-রেখায় পাইতেছি ঋষি, পূর্ব্বাচার্য্য ও গুরুবর্গকে। অনুভূতির একটা মুখ্যধারা শব্দ। সুতরাং শব্দের নানান্ থাক্ বুঝাইতেও এই চিত্রের ব্যবহার চলিবে। জহ্নুমুনি বেদশব্দরাশি স্বয়ং উপলব্ধি করিয়া যদি তাহা শিষ্য-প্রশিষ্যক্রমে চালাইয়া না দেন, তবে ত ধারা ঐখানেই থামিয়া গেল ; আমাদের মত ভস্মত্বপ্রাপ্ত সগরসন্ততিগণের উদ্ধারের ত কোনও ব্যবস্থা হইল না। তাই জহ্নুমুনিকে জঙ্ঘা চিরিয়া আবার গঙ্গাজীকে বাহির করিয়া দিতে হইল। 'জঙ্ঘা' বলিতে উত্তমাঙ্গ হইতে অধমাঙ্গে অবতরণ—উচ্চ থাক্ হইতে শিষ্য-সম্প্রদায়-কল্যাণ-কামনায় নিম্ন থাকে নামিয়া আসা বুঝান হইল। পদ্মাসুরের পিছন পিছন গিয়া আমাদের আর পথভ্রষ্ট হইবার প্রয়োজন নাই। সাধক-সম্প্রদায়-প্রবাহটাকে অবিচ্ছিন্ন রাখিবার জন্য, বেদশব্দের গ্লানি ও শব্দসঙ্করের অভ্যুত্থান নিবারণ করিবার জন্য, ভগীরথের তপস্যাকে সূত্র ও উপলক্ষ্য করিয়া, সনাতন শব্দমালার আমাদের লোকে যে অবতরণ, তাহাই গঙ্গার আবির্ভাব—এই মূল কথাটি উপাখ্যানের ভিতর হইতে স্পষ্ট হইয়া উঠিল না কি ? পর-শব্দ, শব্দতন্মাত্র, সূক্ষ্মশব্দ ও স্থূলশব্দ, এই কয়টি ধাপে ধাপে শব্দ যে আমাদের লোকে (planeএ) নামিয়া আসে, তাহার সন্ধান এই

আখ্যায়িকার মধ্যে আমরা পূর্ব্বেই আবিষ্কার করিতে পারিয়াছি। 'সনাতন শব্দমালা' শুনিয়া নাস্তিক মহাশয় যেন চম্‌কাইয়া না উঠেন। ইহা একটা সংজ্ঞা, যেমন গণিত শাস্ত্রের অনেক সংজ্ঞা। সংজ্ঞাটি এই :—যে কোনও দ্রব্যের মূলে অবশ্যই একটা শক্তিব্যূহ (System of Constituting Forces) রহিয়াছে। যদি সেই শক্তিব্যূহ জনিত চাঞ্চল্য কোনও পারমার্থিক শ্রবণসামর্থ্যের কাছে শব্দরূপে ধরা পড়ে, তবে সেই শব্দই সে দ্রব্যের স্বাভাবিক শব্দ, বীজমন্ত্র বা বৈদিক শব্দ। বলা বাহুল্য, লক্ষণ মানিতে গেলে বলিতেই হইবে যে, এ প্রকার শব্দের সহিত তাহার বিষয়ের বা অর্থের সম্বন্ধ নিত্য বা সনাতন। কোনও দ্রব্যের তিনটি বিন্দু সংযুক্ত করিয়া, ধর, একটা সরলরেখা পাইলাম ; এখন দ্রব্যটি স্থিরই থাকুক আর চলিয়াই বেড়াক, তাহার সেই তিনটি বিন্দু যদি এক সরলরেখাতেই বরাবর থাকিয়া যায়, তবে সেই দ্রব্যকে গণিতের পরিভাষায় কঠিন দ্রব্য (Rigid Body) বলে। সত্য সত্যই সেরূপ কোন জড়দ্রব্য আছে কি না, সে স্বতন্ত্র কথা। তার কোনও মনগড়া (*à priori*) উত্তর দেওয়া যায় না ; পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হয়। বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও, স্ব স্ব অর্থের সঙ্গে নিত্যসম্বন্ধের বন্ধনে বদ্ধ ('বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ' উপমা দিবার জিনিষ হইয়া আছে) কোনও স্বাভাবিক শব্দমালা সত্যসত্যই আছে কি না, তাহারও কোনও মনগড়া উত্তর দেওয়া যায় না। ইহারও সত্যতা পরীক্ষা-সাপেক্ষ। আমাদের কিন্তু লক্ষণ ও পরিভাষা করিতে কোনই বাধা নাই। কেন এইরূপ পরিভাষা করিতেছি তাহার কৈফিয়ৎ পূর্ব্বপ্রবন্ধে বোধ হয় কতকটা পরিষ্কার হইয়াছিল। নাস্তিক মহাশয়ের সঙ্গে আপাততঃ আমরা আর আলাপ করিব না। মধুকৈটভবধ ও গঙ্গার ভূতলে অবতরণ, এই দুইটা বৃত্তান্তের মধ্যে আমাদের শব্দতত্ত্বের অনেক মর্ম্মকথা আমরা টানিয়া বাহির করিতে পারিলাম। উপাখ্যানের যে যে অংশে শাস্ত্র-

কারেরা রহস্যোদ্‌ঘাটনের চাবিকাটিটি ফেলিয়া রাখিয়াছেন, সেই সেই অংশ হাতরাইয়া আমরা একবারে বিফলমনোরথ হই নাই। পূর্ব্বোপাখ্যানে 'কর্ণমল' শব্দটি এবং পরের উপাখ্যানে 'গোমুখী' প্রভৃতি শব্দ না পাইলে, আমাদের তথ্যান্বেষণ সহজ ও সফল হইত না। "গঙ্গা গঙ্গেতি যো ব্রূয়াদ্ যোজনানাং শতৈরপি"—গঙ্গা সলিলে অবগাহন করিয়া এই মন্ত্র স্মরণ করিতে করিতে গঙ্গার মন্ত্রাত্মিকা মূর্ত্তিটিই উজ্জ্বল হইয়া হৃদয়ে জাগিয়া উঠে; মন্ত্র বিশুদ্ধভাবে উচ্চারণ করিতে পারিলেই তাহা অর্থসফলতায় ধন্য হইয়া উঠিবে, এই মহাসত্যটিই আমাদের বুদ্ধিতে ভাসিয়া উঠে। তবে আশঙ্কা হয়, কলির প্রভাবে শব্দসঙ্কর, শব্দবিকার ও শব্দ-সঙ্কোচ যে-মাত্রায় বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহাতে গুরুপরম্পরাগত স্বাভাবিক শব্দমালা গঙ্গারূপে এই মেদিনীমণ্ডলের কলুষ-কলঙ্ক ক্ষালন করিতে, সাধকের যোগক্ষেম বহন করিয়া আনিতে, আর বেশী দিন বুঝি থাকিবেন না। ভগবানের মীনকলেবরে, বরাহমূর্ত্তিতে যে পুনঃ পুনঃ বেদ-সমুদ্ধার, প্রলয়পয়োধিজলে বটপত্রে শয়ান হইয়া তাঁহার যে বেদ রক্ষা—সে সকল কথার তলাইয়া আলোচনা করিতে যাইলেও আমরা শব্দতত্ত্বেই গিয়া উপনীত হইব। তবে সে আলোচনার অবসর আজ আর আমাদের নাই। মোটামুটি উপাখ্যান দুইটির যতটুকু আলোচনা আমরা করিতে পরিলাম, তাহাতে, আশা করি, আমাদের বেদপুরাণের আখ্যায়িকাগুলি যে একেবারে গুলির আড্ডায় রচিত হইয়াছে, এরূপ মনে করিতে নাস্তিক মহোদয়েরও কতকটা দ্বিধা অতঃপর হইবে।

আমাদের দেওয়া শব্দের বিবরণটি শাস্ত্রসিদ্ধান্তের কতটা কাছে বা দূরে রহিয়াছে, তাহা অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। আমার নিজের বিশ্বাস, বড় বেশী দূর দিয়া যায় নাই। দুই-একটা পরিভাষা পণ্ডিত মহাশয়দের দেওয়া পরিভাষার সঙ্গে হয় ত ঠিক

খাপ্ না খাইতে পারে। পরশব্দকে 'পরশব্দ' বলিবার ভিত্তি কি? আমরা যাহাকে শব্দতন্মাত্র বলিলাম তাহাই কি আমাদের পূর্ব্বাচার্য্য-গণের অনুমোদিত শব্দতন্মাত্র?—এইরূপ দুই-একটা পরিভাষা-সংক্রান্ত প্রশ্নের ঠিক্ উত্তর কি দিব, সে বিষয়ে হয় ত কতকটা ভাবনা হইতে পারে। কিন্তু বিজ্ঞানের দিক্ হইতে অগ্রসর হইয়া সার জন উড্রফ আমাদিগকে বেদশব্দের ও মন্ত্রের যে লক্ষণ ও ব্যাখ্যান দিলেন, তাহা আদৌ শাস্ত্রের দিক্ মাড়াইল না, একথা বলিলে, আমার বোধ হয়, কতকটা আনাড়ীর মত কথা বলা হইবে। দর্শনগুলিসম্বন্ধে যাহাই হউক, উপনিষৎ বা অধ্যাত্মশাস্ত্র নৈয়ায়িক মহাশয়ের ফরমাইশ-মত ঠিক্ চলেন নাই। শিশু জিজ্ঞাসা করিল —পৃথিবী কেমনধারা পথে সূর্য্যের চারিধারে পাক্ দিতেছে? আমি তাহাকে বলিলাম—বৃত্তের মত গোলাকার পথে। কিন্তু পথ ত ঠিক বৃত্তের মত নয়; শিশু বড় হইলে, তার বুদ্ধি আরও একটু পরিপক্ক হইলে, আমি ভুল সংশোধন করিয়া দিলাম; বলিয়া দিলাম যে পথটি বৃত্ত নহে, বৃত্তাভাস (ellipse)। বিশেষজ্ঞেরা জানেন যে এখানেও অব্যাহতি নাই, প্রয়োজনমত আরও সংশোধন করিয়া লইতে হয়। অধ্যাত্মশাস্ত্রেও এইরূপ। শিষ্যের ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা হইল, গুরু বলিলেন, 'তুমি যে অন্ন খাইতেছ তাহাই ব্রহ্ম'। পরে সংশোধন করিয়া বলিলেন, 'প্রাণ ব্রহ্ম'; এইরূপে শিষ্যের অধ্যাত্ম-দৃষ্টি যতই প্রস্ফুটিত ও প্রসারিত হইতে লাগিল, ততই তাঁহাকে গুরু ব্রহ্মের নূতন নূতন মূর্ত্তি দেখাইতে লাগিলেন; 'ব্রহ্ম' শব্দটা বাহাল রাখিলেন, কিন্তু তাহার লক্ষণ ক্রমশঃ বদ্‌লাইয়া দিতে লাগিলেন; শেষকালে শিষ্য আপনিই উপলব্ধি করিলেন যে ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ। একই শব্দের এই পাঁচটা লক্ষণ একসঙ্গে পাশাপাশি ফেলিয়া রাখিলে নৈয়ায়িক মহাশয়ের শিরঃপীড়ার গুরুতর কারণ অবশ্যই ঘটিবে, কিন্তু যেখানে সাধকের বুদ্ধি ধীরে-

ধীরে বিকশিত হইয়া একটার পর আর একটা, ব্যাপক হইতে ব্যাপকতর, লক্ষণ আবিষ্কার করিয়া লইতেছে, সেখানে আগাগোড়া একটা শব্দই বাহাল রাখিলে ক্ষতি নাই; বরং তাহাই স্বাভাবিক। ব্রহ্ম কি—আত্মা কি—তাহাই আমি জানিতে চাহিয়াছি; আমার জানা ক্রমশঃই হয় ত গভীরতর ও ব্যাপকতর হইতে থাকিবে; কিন্তু আমার অনুসন্ধান অন্বেষণের জিনিষ ত একই রহিয়াছে—ক্রমশঃ তাহাকে ভাল করিয়া চিনিতে ও ধরিতে পারিতেছি মাত্র। এ ক্ষেত্রে আমার অন্বেষণের সামগ্রীর নামটা বদ্‌লাইয়া না ফেলাই ভাল। তাই, অন্নই ভাবি, আর প্রাণই ভাবি, আর মনই ভাবি, আমি খুঁজিতেছি আত্মাকে, ব্রহ্মকে। যেমনটা বুঝিতেছি তেমনটা লক্ষণ দিতেছি। অধ্যাত্মশাস্ত্রের ইহাই রীতি। অরুন্ধতী-দর্শন-ন্যায়। নবোঢ়া বধূকে পাতিব্রত্যের নিদর্শনস্বরূপ অরুন্ধতী-নক্ষত্র দেখানর প্রথা পূর্ব্বে ছিল। অরুন্ধতী কিন্তু ছোট তারা, সহজে দেখা যায় না। তাই নিকটের একটা স্থূল, উজ্জ্বল তারার দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া স্বামী বধূকে বলিলেন—'ঐ দেখ অরুন্ধতী'। যখন বধূর দৃষ্টি তাহাতে সুস্থির হইল তখন আবার স্বামী বলিলেন—'না ওটা নয়, উহার নিকটে যে ছোট তারাটি রহিয়াছে, উহাই অরুন্ধতী'। অধ্যাত্মবিজ্ঞান এই রীতিতে আমাদের আত্ম-সাক্ষাৎ-কারের পথপ্রদর্শক হইয়া থাকেন। শব্দ একটা, তার পরিভাষা পাঁচ রকমের। যাঁহারা উপনিষৎগুলি ভাল করিয়া ঘাঁটিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে 'আকাশ', 'প্রাণ', 'বায়ু' প্রভৃতি শব্দের পরিভাষা ও প্রয়োগ পূর্ব্বোক্ত অরুন্ধতী-দর্শন-ন্যায়ে হইয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত ব্রহ্মবস্তুই লক্ষ্য, কিন্তু তাহা সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম বলিয়া, এই শব্দগুলির মোটা মোটা লক্ষণগুলি আদৌ আমাদের সম্মুখে উপনীত করা হইয়াছে। এই নজিরে সার জন উড্‌রফ চৈতন্যের স্বরূপের চঞ্চল অবস্থাটিকে প্রকৃতির বলিয়া অন্যায় করেন নাই।

বিশেষতঃ শ্রুতি জগৎ-প্রবাহকে যে শব্দপূর্ব্বক বলিতেছেন তাহা মূলতঃ স্পন্দ বা চাঞ্চল্য বই আর কিছুই নহে। সাম্যাবস্থার (cosmic equilibriumএর) অবসানে যে বৈষম্যের প্রথমোন্মেষ (initial cosmic dis-equilibrium), তাহাকে চাঞ্চল্য ছাড়া আর কি বলিব? সাংখ্যকার প্রকৃতি এবং শব্দতন্মাত্রের মাঝে যে মহত্তত্ত্ব ও অহঙ্কার নামক দুইটা তত্ত্ব বসাইয়াছেন, সে দু'টাকে জড়াইয়া, পরশব্দ বলিলে দোষ হয় না; কারণ, সে তত্ত্ব দুইটা বৈষম্যাত্মক এবং বিক্ষোভাত্মক; এবং আমাদের পরিভাষা মত, বিক্ষোভ বা চাঞ্চল্যই পরশব্দ। শ্রুতি ঈক্ষণাপূর্ব্বক শব্দতন্মাত্র ও আকাশের সৃষ্টি করিতেছেন; আমরা সেই ঈক্ষণাকে পরশব্দ বা 'পশ্যন্তীবাক্' বলিতে পারি না কি? বলা বাহুল্য, আমরা শব্দের দিক্ হইতেই হিসাব লইতেছি। ইহাই সৃষ্টির গোড়ার কথা। আমরা ইহাকে পরশব্দ বলিয়া নৈয়ায়িকের কাছে হয় ত দোষ করিলাম, কিন্তু শ্রুতির রীতি-পদ্ধতি লঙ্ঘন করিয়া যাইলাম কি? শব্দতন্মাত্র-সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ দিতে চেষ্টা আর করিব না। তবে স্মরণ রাখিবেন, আমাদের লক্ষণমত, ইহা বিশুদ্ধ স্বাভাবিক শব্দ —নিরতিশয় শ্রবণ-সামর্থ্য দ্বারা গৃহীত শব্দ।

স্বাভাবিক শব্দের কিভাবে পরীক্ষা লইতে হইবে, তাহা আমরা পূর্ব্বপ্রবন্ধে বিশেষভাবে বলিয়াছি। দ্রব্য ও অর্থ থাকিলেই যে শব্দ থাকে (অবশ্য পারমার্থিক কর্ণে শ্রুত), এবং যে শব্দ থাকিলেই তাহার অর্থ নির্ম্মিত হইয়া যায় (অবশ্য বিশুদ্ধভাবে উচ্চারিত হইলে), সেই শব্দই স্বাভাবিক শব্দ। ইহাই স্বাভাবিক শব্দের পরীক্ষা (test)। স্বাভাবিক শব্দ-সম্বন্ধে আর দুইটি আসল কথা বলিয়া আমরা আপাততঃ বিদায় লইব। প্রথম কথাটি এই। লাটিম ঘুরিতেছে, তার ঘোরাটা অবশ্য একটা অক্ষের (axis of rotationএর) অবলম্বনে হয়; আমাদের পৃথিবীও একটা অক্ষ

অবলম্বন করিয়া পাক খাইতেছে। চুরুটের ধোঁওয়া পাক দিতে দিতে উপরে উঠিতেছে, এইরূপ পাক দেওয়াও অবশ্য-একটা অক্ষ আশ্রয় করিয়াই হইতেছে। হেল্‌মহোল্‌জ ও লর্ড কেল্‌ভিন্‌ মনে করিতেন যে অণুগুলি ঈথারসাগরে ঐরকম এক-একটা আবর্ত্ত। যদি তাহাই হয়, তবে তাহাদের আবর্ত্তনও এক-একটা অক্ষ আশ্রয় করিয়াই হইতেছে। ইলেক্‌ট্রন্‌গুলা অণুর (atomএর) ভিতরে নাকি পাক খায়—সেখানেও তবে অক্ষ ভাবিয়া লইতে আমাদের অধিকার আছে। যেখানে গতি কেবল একদিকে সোজাসুজি চলিয়া যাওয়া, সেখানে সেই গতির রেখাটিই অক্ষ। যেখানে আবর্ত্তন (rotation) হইতেছে, সেখানে অক্ষ সেই রেখাটি, যার চারিধারে এবং যার আশ্রয়ে আবর্ত্তন হইতেছে। গাড়ীর চাকার অক্ষ যেমন। যে দুই প্রকারের গতি বলিলাম, সেই দুইটার বিবিধ সংমিশ্রণে সকল প্রকার গতি হইতেছে। এইজন্য অক্ষের সাহায্যেই সকল প্রকার গতির হিসাব আমাদের লইতে হয়। গণিতশাস্ত্র অক্ষের সাহায্যে (co-ordinate axesএর সাহায্যে) গতির (curve of motionএর) বিশ্লেষণ ও বিবরণ দিতে গিয়া নিতান্ত আজ্‌গবি একটা কিছু করিয়া বসেন নাই। তাই আমাদের বলিতে সাহস হয়, অক্ষের কথা গত্যাত্মক এই জগতের গোড়ার একটা কথা। গতির পরীক্ষা করিয়া ইহা আমরা পাইলাম। পদার্থসমূহের, বিশেষতঃ সজীব পদার্থসমূহের উৎপত্তি কিরূপে হইতেছে, তাহা যদি আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখি, তবে আমরা অক্ষ (axis of generation) জিনিষটাকেই বেশ স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাই। গাছ হইতেছে—একটা মূলকাণ্ডকে অবলম্বন করিয়া শাখা প্রশাখা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে; একটা পাতা পরীক্ষা করিয়া দেখুন, একটা মুখ্য শিরাকে অবলম্বন করিয়া শত শত শিরা প্রশিরা পত্রাবয়বে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

অতএব এখানে অক্ষের ব্যবস্থা রহিয়াছে। একটা লতা এই বর্ষার রসে বাড়িয়া গাছ ছাইয়া ধরিয়াছে। পরীক্ষা করিলে দেখিব একটা মূল অক্ষের আশ্রয়ে লতার নানাদিকে নানা ফেঙ্‌ড়া বাহির হইয়াছে। একটা মুল (primary) অক্ষ; তাহা হইতে আবার কত গৌণ (secondary) অক্ষ বাহির হইয়াছে। উচ্চশ্রেণীর জীবদেহ পরীক্ষা করিলে দেখি মেরুদণ্ড (Spinal axis) কে আশ্রয় করিয়া স্নায়ুজাল সর্ব্বাঙ্গে ছড়াইয়া পড়িয়া প্রাণনব্যাপার নির্ব্বাহ করিতেছে। ভাইজ্‌মান প্রভৃতি জীবতত্ত্ববিদেরা আমাদের বলিয়াছেন যে বংশ-পরম্পরায় একটাই বীজপদার্থ (Germplasm) বরাবর বহিয়া যায়; তোমাতে আমাতে তাহার অল্পবিস্তর বিভিন্ন মূর্ত্তি প্রকাশ পাইতেছে বটে, কিন্তু আমাদের ভিতর বংশগত বীজটি, তাহার নিজস্ব প্রকৃতিটিকে প্রায় অবিকৃত ও অবিচ্ছিন্ন রাখিয়াই, বহিয়া যায়। আমার পিতামহ, পিতা ও আমি একই অক্ষকে আশ্রয় করিয়া লতার নানা ফেঙ্‌ড়ার মত এদিক-ওদিক ছড়াইয়া পড়িয়াছি; কিন্তু আমাদের সকলকে একসূত্রে সম্বদ্ধ করিয়া রাখিতে বংশধারা, লতার মুখ্য অক্ষ-দণ্ডটির মত, অবিচ্ছিন্নভাবেই বহিয়া যাইতেছে। আমার উৎপত্তি, আমার পিতার উৎপত্তি এই অক্ষকে আশ্রয় করিয়াই হইয়াছে। আর দৃষ্টান্ত লইব না, তবে কথাটা দাঁড়াইল যে, অক্ষ জিনিষটা সৃষ্টি বা অভিব্যক্তি ব্যাপারে গোড়ার কথা। অক্ষ, মুখ্য বা গৌণ হইতে পারে—লতার দৃষ্টান্তে, মূল অক্ষ ছাড়া, ফেঙ্‌ড়াগুলিরও ছোট ছোট অক্ষ আছে। এখন সমস্যা এই—জগতে বিচিত্র শব্দ রহিয়াছে; নানা জীবের নানা শব্দ; নানা জাতির নানা ভাষা; তোমার আমার শব্দও ঠিক এক নহে; বিশ্বে এই শব্দ-বৈচিত্র্যের উৎপত্তি—নানাপ্রকার ভাষার উৎপত্তি—কি কোনও অক্ষ আশ্রয় করিয়া হয় নাই; ধ্বনিবৈচিত্র্যগুলি ভাল করিয়া খুঁজিয়া পাতিয়া দেখিলে তাদের মধ্যে আমরা কি কোন কোনও মূল-

শব্দের (primaries) আবিষ্কার করিতে পারি না? ফুরিয়ারের রীতিতে গণিতবিৎ যে কোনও জটিল ছন্দোবদ্ধ গতিকে (complex harmonic motion কে) সরল ছন্দোবদ্ধ গতিতে (simple harmonic motionএ) ভাঙ্গিয়া দেখাইয়া দিতে পারেন, একথা আপনারা ভুলিবেন না। বিরাট্ শব্দ-বৈচিত্র্যের ভিতরে আমরা কি একটা অবিচ্ছিন্ন মৌলিক শব্দ-ধারা আবিষ্কার করিবার আশা করিতে পারি? লতা টানিয়া তার মুখ্য মেরুদণ্ডটি আমরা যেরূপ বাহির করিয়া লইতে পারি, সেইরূপ? এ প্রশ্নের উত্তর,—আমাদের সেরূপ আবিষ্কার করিতে পারাই উচিত; এবং তাহাই যদি হয়, তবে এটা আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, শব্দের এই বিরাট্ বিশ্বরূপ মূর্ত্তির যাহা মেরুদণ্ড (axis of generation), নিখিল শব্দরাশির যাহা মূল প্রকৃতি, তাহাই সেই স্বাভাবিক শব্দপ্রবাহ, বেদশব্দ ধারা, গঙ্গার আবির্ভাব, যাহার কথা এই দুই দিন ধরিয়া আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি। "ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্"—এই অব্যয় অশ্বত্থ বৃক্ষটিকে আমরা এতক্ষণে চিনিতে পারিলাম কি? প্রাজাপত্য-ভূমি হইতে আমাদের থাকে শব্দপ্রবাহ নামিয়া আসিয়াছে, তাই ঊর্দ্ধমূল, অধঃশাখ এই বৃক্ষ। বৃক্ষের একটি মূলকাণ্ড অবলম্বন করিয়া চারিদিকে নানা শাখা-প্রশাখা ছড়াইয়া পড়ে, পত্র পুষ্পাদি উদ্গত হয়, সেইরূপ প্রজাপতির স্বাভাবিক শব্দ বা বীজমন্ত্রগুলি নিম্ন ভূমিতে (lower planeএ) নামিয়া আসিতে গিয়া একটা মেরুদণ্ডের আশ্রয় লইয়াছে—সেই মেরুদণ্ডকে আশ্রয় করিয়াই নিখিল শব্দ-বৈচিত্র্য একটা মহা পাদপের মত বিশ্বে ছড়াইয়া পড়িয়াছে; সেই মেরুদণ্ডই হইল স্বাভাবিক শব্দ-ধারা, যাহা গুরুপরম্পরাক্রমে কতক পরিমাণে আমাদের কাছেও পৌঁছিয়াছে। এ স্বাভাবিক শব্দ-ধারাই সকল শব্দের প্রকৃতি ও আশ্রয়। যে ঐ অশ্বত্থ বৃক্ষটিকে চিনিয়াছে, সে বেদ চিনিয়াছে—যস্তং বেদ স বেদবিৎ। যাবতীয় শব্দের সঙ্গে স্বাভাবিক শব্দের সম্বন্ধ এই প্রকার।

আর একটা কথা। একটা চুম্বক লইয়া পরীক্ষা করিলাম। সেই চুম্বকটি যে শক্তিব্যূহ (field, lines of force) রচনা করিয়া রাখিয়াছে, আমরা পরীক্ষা দ্বারা সেই শক্তিব্যূহের (lines of forceএর) একটা প্রতিকৃতি আঁকিয়া দিতে পারি।., বিজ্ঞানাগারে প্রত্যেক বালককে এইরূপে পরীক্ষা করিয়া চৌম্বক শক্তি ও তাড়িত শক্তির সমাবেশ বা সংস্থানের নক্সা আঁকিয়া ফেলিতে হয়। যে নক্সা খানা আমরা পাই তাহা সেই শক্তিব্যূহের চাক্ষুষ প্রতিকৃতি (visual representation)। এখন দেখুন, রং বা হং এক একটা বীজমন্ত্র। ইহারা এক-একটা শক্তিব্যূহের শাব্দিক প্রতিকৃতি। কথাটা পূর্ব্বেই বুঝাইয়াছি। কিন্তু সেই সেই শক্তিব্যূহের এক-একটা চাক্ষুষ প্রতিকৃতি (visual or optic equivalent) ও থাকিবে। চুম্বকের যেমন ধারা থাকে। আমরা ধরিতে পারি আর নাই পারি, আছে। চুম্বকের বেলায় যেমন এ ক্ষেত্রেও তেমনি, পরীক্ষা দ্বারা সেই চাক্ষুষ প্রতিকৃতি আমাদের আবিষ্কার করিয়া লইতে হয়। ফল কথা, শব্দের দিক্ হইতে দেখিলে শক্তিব্যূহ যেরূপ স্বাভাবিক শব্দরূপে ব্যক্ত হয়, রূপের দিক্ হইতে দেখিলে, তাহা সেইরূপ স্বাভাবিক রূপভাবে ব্যক্ত হয়। শব্দের বেলায় যেমন পারমার্থিক কর্ণ, দিব্যকর্ণ ও ভৌতিক কর্ণ রহিয়াছে, রূপের বেলায়ও তেমনি পারমার্থিক চক্ষু, দিব্যচক্ষু ও ভৌতিকচক্ষু থাকিবে। স্বাভাবিক শব্দকে আমরা বলিয়াছি মন্ত্র, আর স্বাভাবিক রূপকে আমরা বলিতেছি যন্ত্র—যথা, শ্রী-যন্ত্র। বৈদিক যজ্ঞ এবং তান্ত্রিক হোম প্রভৃতির অনুষ্ঠানে মন্ত্র যেমন চাই, যন্ত্রও তেমনি চাই ; মন্ত্র ও যন্ত্রের "কুসংস্কার" এতক্ষণে আমরা একটু বুঝিতে পারিলাম কি ?

আমরা এতক্ষণ ধরিয়া খাঁটি স্বাভাবিক শব্দের আলোচনাই করিলাম। কিন্তু স্বাভাবিক শব্দের অর্থটাকে স্থিতিস্থাপক (elastic) মনে করিয়া সার জন্ উড্রফ ইহার বেশ একটা শ্রেণীবিভাগও

আমাদের দিয়াছেন। পূর্ব্বপ্রবন্ধে ইহার উল্লেখ মাত্র করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলাম, আজও আমাদের আর অবকাশ নাই। সে শ্রেণী বিভাগের সামান্য একটু নমুনা দেখাইয়াই আজিকার মত ক্ষান্ত হইব। অপর শব্দ লইয়া শ্রেণী বিভাগ করিতেছি।

অপর শব্দ দ্বিবিধ—স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক (artificial)। কোন একটি পদার্থকে বুঝাইবার জন্য আমরা অনেক সময় যদৃচ্ছাক্রমে (arbitrarily) কোনও একটি বাচনিক সঙ্কেত (vocal sign) ব্যবহার করিয়া থাকি ; যে সঙ্কেতটি ব্যবহার করিয়া থাকি, সেই সঙ্কেতটি ব্যবহার না করিয়া অন্য সঙ্কেত ব্যবহার করিলেও চলিত ; যে নামে ডাকিতেছি সেই নামেই ডাকার কোনও নিয়ত হেতু নাই। যেমন, আমরা কোন ব্যক্তিকে যদু বা হরি এই নামে ডাকিয়া থাকি। এই নাম অস্বাভাবিক বা কৃত্রিম বা মনগড়া নাম। বলা বাহুল্য, আমাদের স্বাভাবিক শব্দ বা নামের যে লক্ষণ তাহা এ-সব ক্ষেত্রে নাই। নাম স্বাভাবিক হইতে হইলে তাহাকে পদার্থের সত্তা ও স্বরূপের সঙ্গে কোনও রূপ একটা সম্পর্ক রাখিতেই হইবে। যে নাম দিতেছি তাহার একটা হেতু বা কৈফিয়ৎ থাকিবেই। সুতরাং এ রকম নাম আমরা আমাদের খোস্ খেয়াল মত দিতে পারি না।

তারপর, স্বাভাবিক নাম আবার দুই প্রকার—নিরতিশয় ও সাতিশয় ; প্রকৃত ও বিকৃত (pure এবং approximate)। পারমার্থিক কর্ণে শ্রুত শব্দতন্মাত্রই নিরতিশয় শব্দ ; তাহাই শব্দের প্রকৃতি। শ্রবণ সামর্থ্যের পরাকাষ্ঠা নাই, এমন কর্ণে শ্রুত শব্দ সাতিশয় শব্দ ; তাহা অল্প বিস্তর বিকৃতিপ্রাপ্ত ; একবারে খাঁটি শব্দ নহে। দিব্যকর্ণ ও লৌকিক কর্ণ এই শব্দ শুনিতে সমর্থ। নিরতিশয় শব্দের পরিভাষা করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া ভিন্ন আমাদের গত্যন্তর নাই। সাতিশয় শব্দের শ্রেণীবিভাগ আমরা করিতেছি। কোনও পদার্থ রহিয়াছে, তাহার মূলীভূত শক্তিব্যূহ সমষ্টিভাবে (as a whole)

দিব্যকর্ণে যে শব্দ উৎপাদন করে, সেই শব্দ সেই পদার্থের মুখ্য (primary) সংজ্ঞা। এইটি পদার্থের বীজমন্ত্র। যেমন, অগ্নির মুখ্য নাম রং; আকাশের হং; প্রাণনক্রিয়ার হংস; ইত্যাদি। এইগুলি মৌলিক অথবা যৌগিক (simple অথবা compound) হইতে পারে। রং পূর্ব্বোক্ত প্রকারের, হ্রীং বা ক্রীং শেষোক্ত প্রকারের। মৌলিক বীজগুলির সংযোগে বা সংমিশ্রণে যৌগিক বীজগুলি হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে, পদার্থের শক্তিব্যূহ ব্যষ্টিভাবে (specifically), আংশিকভাবে, ক্রিয়া করিয়া যে শব্দানুভূতি জন্মায় সে শব্দকে, সেই পদার্থের গৌণ (secondary) নাম বলা চলিবে। এ নাম বীজমন্ত্র নহে। ধর কাক ডাকিল; তাহার ডাক শুনিয়া তার নাম দিলাম কাক; এখানে যে শক্তিব্যূহ কাককে কাক করিয়া রাখিয়াছে, তাহারই একটা আংশিক অভিব্যক্তি তাহার ডাকে; কাকের চলা-ফেরা, খাওয়া-বসা প্রভৃতি অপরাপর অভিব্যক্তিও রহিয়াছে; কাক শব্দও নানা রকমের করে। অতএব আমরা বলিতে পারি যে, 'কাক' এই শব্দটা কাকের গৌণ স্বাভাবিক নাম। আবার, কাক নিজেই ডাকে; কেহ তাহাকে ডাকাইয়া দেয় না। অতএব, তাহার শব্দ স্বতঃ-সম্ভূত। ঢাকে কাটি দিয়া তাহার ধ্বনি শুনিলাম; ধ্বনি শুনিয়া তার নাম দিলাম ঢাক। এই নাম তাহার গৌণ স্বাভাবিক নাম। তবে এ ক্ষেত্রে শব্দ স্বতঃ-সম্ভূত নহে, পরতঃ-সম্ভূত। এই দুই স্থলেই শক্তিব্যূহ ব্যষ্টিভাবে সাক্ষাৎসম্বন্ধে শ্রবণেন্দ্রিয়টাকে উত্তেজিত করিতেছে; কাকের শব্দ বা ঢাকের শব্দ আমি শুনিতেছি ও শুনিয়া নাম দিতেছি।

কিন্তু আমাদের অধিকাংশ শব্দ অন্য রকমের। অগ্নির মুখ্য স্বাভাবিক নাম বা বীজ রং। কিন্তু তাহাকে অগ্নি বলিতেছি কেন? অগ্নি জ্বলিলে তাহার লেলিহান্ শিখা এবং কুণ্ডলাকারে ঊর্দ্ধগামী ধূম আমরা দেখি; এই বক্রগতি বা আবর্ত্তের মত গতি বুঝাইতে চাই; তাহা করিতে গিয়া 'অগ্' ধাতু আমরা আবিষ্কার করি; তাহার উপর

যথাযোগ্য প্রত্যয় করিয়া 'অগ্নি' শব্দ পাই। এই 'অগ্নি' শব্দ আমাদের চোখে দেখা অগ্নির একটা ধর্ম্ম বা সম্বন্ধ বুঝাইতেছে। শুধু 'রং, বলিলে এই ধর্ম্ম বা সম্বন্ধ বিশেষভাবে সূচিত হয় না। 'অগ্' ধাতু 'অ'ও 'গ' এই দুইটা বর্ণের সমাবেশে হইয়াছে ; 'অ' ও 'গ' খুব-সম্ভবতঃ দিব্যকর্ণে শ্রুত বক্রগতির মুখ্য স্বাভাবিক নামের উপাদান। প্রত্যেক বর্ণ এক-একটা অর্থের (যোগভাষ্যকারের মতে নিখিল অর্থের) মুখ্য নাম বা বীজ ; এবং তাহাদের বিবিধ সংযোগ ও সংস্থান দ্বারা কোনও-একটা পদার্থের বা ক্রিয়ার মুখ্য স্বাভাবিক নাম হওয়া বিচিত্র নহে। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা অন্যত্র করিব। একটা ধর্ম্ম বা সম্বন্ধ বুঝাইবার জন্য 'অগ্নি' ; অপরাপর ধর্ম্ম বা সম্বন্ধ বুঝাইবার জন্য সেইরূপ 'বহ্নি' (হুতদ্রব্য দেবতার উদ্দেশ্যে বহন করে), 'হুতাশন', 'বৈশ্বানর' (বিশ্বনর বা সর্ব্বজীবে পাচকাগ্নিরূপে বর্ত্তমান) প্রভৃতি নাম রহিয়াছে। কাকের ডাকের মত এগুলি সাক্ষাৎসম্বন্ধে কাণে শোনা শব্দের অনুরূপ নহে। শক্তিব্যূহ ব্যষ্টিভাবে চক্ষু, ত্বক্ প্রভৃতি অপরাপর ইন্দ্রিয়গুলিকে চেতাইয়া কতকগুলি ধর্ম্ম ও সম্বন্ধের জ্ঞান আমাদের দিতে পারে— যেমন অগ্নির দৃষ্টান্তে বক্রগতি প্রভৃতি। সেই ধর্ম্ম ও সম্বন্ধ বুঝাইবার জন্য ধাতু, উপসর্গ, প্রত্যয়াদি লইয়া আমাদের এক-একটা নাম গড়িয়া লইতে হয়—আমরা নিজেরাই গড়িয়া লই, অথবা পরম্পরাক্রমেই প্রাপ্ত হই। এগুলিও খুবই প্রয়োজনীয় শব্দ। এগুলির যথাযথ সংযোগ সংস্থান করিয়া সমর্থ বেদমন্ত্র বা তান্ত্রিক মন্ত্র হইতে পারে। তবে এ বিরাট্ ব্যাপারের আলোচনায় আজ আর প্রবৃত্ত হইব না।